

থাকিলেই বা কি হইবে, যেমন খিজির (আঃ) সেকান্দর বাদশাকে আবে
হায়াতের নিকট হইতে পিপাসার্ত অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

কত সৌভাগ্যবান ঐ সকল মাশায়েখ যাহারা এই কথা বলিতে পারেন
যে, বালেগ হওয়ার পর হইতে আমার কখনও শবে কদরের এবাদত ছুটে
নাই। তবে এই মুবারক রাত্রি ঠিক কোন্টি? এই ব্যাপারে ওলামায়ে
কেরামের মধ্যে দীর্ঘ মত-পার্থক্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশটি
অভিমত আছে। সবগুলির আলোচনা করা খুবই কঠিন। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ
অভিমতগুলির আলোচনা সামনে আসিতেছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই
রাত্রির বিভিন্ন রকমের ফযীলত সম্বলিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।
উহারও কিছু কিছু এখানে পেশ করা হইবে। কিন্তু এই রাত্রির ফযীলত
যেহেতু স্বয়ং কুরআনে পাকে উল্লেখিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে একটি
পৃথক সূরাও নাযিল হইয়াছে, কাজেই প্রথমে এই সূরার তফসীর লিখিয়া
দেওয়া উত্তম মনে হইতেছে। আয়াতের অর্থ হাকীমুল উম্মত হযরত
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর 'তফসীরে বয়ানুল কুরআন'
হইতে এবং ফায়দাসমূহ অন্যান্য কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থ : নিশ্চয় আমি এই কুরআনকে কদরের রাত্রিতে নাযিল
করিয়াছি। (সূরা কদর, আয়াত : ১)

ফায়দা : অর্থাৎ কুরআনে পাক লওহে মাহফুজ হইতে এই রাত্রিতে
দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই একটি মাত্র বিষয়ই এই রাত্রির
ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল যে, কুরআনের ন্যায় এমন মহামর্যাদাশীল
জিনিসও এই রাত্রিতে নাযিল হইয়াছে। তদুপরি ইহার সহিত আরও বহু
বরকত ও ফযীলতও শামিল রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই
রাত্রির প্রতি শওক ও আগ্রহ আরও বাড়াইবার জন্য এরশাদ করিতেছেন—

وَمَا أَكْثَرُ مَا نَزَّلْنَا الْقَدْرُ

আপনি কি জানেন শবে কদর কত বড় জিনিস? (সূরা কদর, আয়াত : ২)

অর্থাৎ, এই রাত্রের মহত্ত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আপনার কি জানা
আছে যে, ইহার মধ্যে কত গুণ-গরিমা ও কি পরিমাণ ফাযায়েল
রহিয়াছে! অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই কয়েকটি ফাযায়েল উল্লেখ
করেন।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

শবে কদর হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। (সূরা কদর, আয়াত : ৩)

অর্থাৎ হাজার মাস এবাদত করিলে যে পরিমাণ সওয়াব হইবে এক
শবে কদরে এবাদত করিলে উহার চাইতেও বেশী সওয়াব হাসিল হইবে।
আর এই বেশী যে কত বেশী তাহা কাহারও জানা নাই।

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

‘এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন।’ (সূরা কদর, আয়াত : ৪)

আল্লামা রাযী (রহঃ) লিখেন যে, ফেরেশতারা সৃষ্টির শুরুতে যখন
তোমাকে দেখিয়াছিল, তখন তোমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল এবং
আল্লাহর দরবারে আরজ করিয়াছিল যে, আপনি এমন এক জিনিস সৃষ্টি
করিতছেন যাহারা দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ও রক্তপাত করিবে। অতঃপর
যখন পিতামাতা বীর্ষের আকারে প্রথম দেখিয়াছিল তখন তোমাকে ঘৃণা
করিয়াছিল, এমনকি যদি তাহা কাপড়ে লাগিয়া যাইত তবে ধুইয়া
ফেলিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন এই বীর্ষ-ফোটাকে উত্তম আকৃতি
দান করিলেন তখন পিতামাতাও তাহাকে স্নেহ ও পেমার করিতে লাগিল।
তদ্রূপ, আজ যখন তুমি আল্লাহর তওফীকে পুণ্যময় শবে কদরে আল্লাহর
মারেফাত ও এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হইয়াছ তখন ফেরেশতারাও
তাহাদের পূর্বকার মন্তব্যের ওজর পেশ করিতে দুনিয়াতে অবতরণ করে।

وَالرُّوحُ فِتْنًا

‘এবং এই রাত্রিতে রুহুল কুদুস অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও
অবতরণ করেন।’ (সূরা কদর, আয়াত : ৪)

রুহ শব্দের অর্থ কি? এই সম্পর্কে মুফাসসিরগণের কয়েকটি অভিমত
রহিয়াছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত উহাই যাহা উপরে
উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ রুহ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে
বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা রাযী (রহঃ) এই অভিমতকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ
বলিয়াছেন। এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই
ফেরেশতাদেরকে উল্লেখ করিবার পর খাছভাবে তাহার উল্লেখ করা
হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেক বড় একজন
ফেরেশতা, যাহার নিকট সমস্ত আসমান যমীন একটি লোকমার সমান।
কেহ কেহ বলিয়াছেন, রুহ দ্বারা ফেরেশতাদের একটি খাছ জামাতকে
বুঝানো হইয়াছে যাহাদেরকে অন্যান্য ফেরেশতাগণও শুধু শবে কদরেই
দেখিয়া থাকেন। চতুর্থ অভিমত হইল এই যে, রুহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা
কোন খাছ মখলুককে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা খানাপিনা করেন ; কিন্তু

ফেরেশতাও নহেন মানুষও নহেন। পঞ্চম অভিমত হইল এই যে, রূহ দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। তিনি উম্মতে মুহম্মদীর এবাদত বন্দেগী দেখিবার জন্য ফেরেশতাদের সহিত অবতরণ করেন। ষষ্ঠ অভিমত হইল, রূহ আল্লাহ তায়ালায় একটি খাছ রহমত। অর্থাৎ, এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন এবং তাহাদের পর আল্লাহ তায়ালায় খাছ রহমত নাযিল হয়। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

‘সুনানে বায়হাকী’ কিতাবে হযরত আনাস (রাযিঃ)এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের একটি দলের সহিত অবতরণ করেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে যিকির বা অন্যান্য এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল দেখিতে পান, তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন।

يَا ذِي الرَّيِّطِ مَنْ كُنَّ أَمْرُهُ

ফেরেশতাগণ তাহাদের পরওয়ারদিগারের হুকুমে প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর বিষয় লইয়া জমিনের দিকে অবতরণ করেন। (সূরা কদর : ৪)

‘মাযাহিরে হক’ কিতাবে আছে, এই কদরের রাত্রেই ফেরেশতাদের জন্ম হইয়াছে এবং এই রাত্রেই হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টি উপাদানসমূহ জমা হইতে শুরু হইয়াছে। এই রাত্রেই জান্নাতে গাছ লাগানো হইয়াছে। আর এই রাত্রে অত্যধিক পরিমাণে দোয়া ইত্যাদি কবুল হওয়া তো অনেক রেওয়ায়াতেই আসিয়াছে। ‘দুররে মানসুরে’র এক রেওয়ায়াতে আছে, এই রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠান হইয়াছে এবং এই রাত্রেই বনী ইসরাঈল গোত্রের তওবা কবুল হইয়াছে।

سَلَامٌ

‘এই রাত্রি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সালাম ও শান্তি।’

অর্থাৎ সারা রাত্রি ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে মুমিনদের উপর সালাম বর্ষিত হইতে থাকে। কারণ, রাত্রভর ফেরেশতাদের এক জামাত আসিতে থাকে এবং অপর জামাত যাইতে থাকে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়াতে এইভাবে ফেরেশতাদের একের পর এক জামাত আসা-যাওয়ার কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, এই রাত্রি পরিপূর্ণরূপে শান্তিময় ; যে কোন ফেৎনা-ফাসাদ ইত্যাদি হইতে নিরাপদ।

هُوَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

‘এই রাত্রি (উল্লেখিত বরকতসমূহ সহ) সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকে।’

(সূরা কদর, আয়াত : ৫)

এমন নয় যে, এই বরকত রাত্রে কোন বিশেষ অংশে থাকে আর অন্যান্য অংশে থাকে না, বরং সমানভাবে সকাল পর্যন্তই এই বরকতসমূহের প্রকাশ ঘটিতে থাকে। এই পবিত্র সূরার আলোচনার পর যাহাতে স্বয়ং আল্লাহ পাক এই রাত্রে কয়েক প্রকার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কথা এরশাদ করিয়াছেন আর হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু হাদীস শরীফেও এই রাত্রে বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ঐ সমস্ত হাদীস হইতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হইতেছে।

① عَنْ أَبِي مُسْرٍةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَ إِحْسَانًا غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (কذا في الترغيب عن البخاري ومسلم)

نَبِي كَرِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَارِشَادِي كَرِجُو شَعْنُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي إِيْمَانٍ كَسَاةٍ أَوْ ثَوَابٍ كِي نِيَّتٍ سَعِي عِبَادَتٍ كِيْلِي كَهْمُ أَوْ هُوَ أَسْ كِي كِيْلِي تَامُ كِنَاهُ مَعَانٍ كَرِيْتِي جَاتِي فِي.

⑤ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের নিয়তে এবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

ফায়দা : দাঁড়াইবার অর্থ হইল, সে নামায পড়ে। অনুরূপভাবে অন্যান্য এবাদত যেমন তেলাওয়াত যিকির ইত্যাদি এবাদতে মশগুল হওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত। সওয়াবের নিয়ত ও আশা রাখিবার অর্থ হইল, রিয়া অর্থাৎ মানুষকে দেখান বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে না দাঁড়ায়। বরং এখলাসের সহিত একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশী করা ও সওয়াব হাসিল করার নিয়তে দাঁড়াইবে। খাতাবী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, বুঝিয়া শুনিয়া সওয়াবের একীন করিয়া মনের আনন্দ ও শওকের সহিত দাঁড়াইবে। বোঝা মনে করিয়া মনের অনিচ্ছায় নয়। আর ইহা তো স্পষ্ট কথা যে, সওয়াবের একীন যত বেশী হইবে এবাদতে কষ্ট সহ্য করা ততই সহজ হইবে। এই কারণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভে যে যত বেশী তরক্কী করিতে থাকে এবাদত-বন্দেগীতে তাহার মগ্নতা ততই বাড়িয়া যায়।

٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ وَمَضَى
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكَ
وَفِيهِ لِكَلِمَةٍ خَيْرٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

৯৩৭

تمنا درود کی ہے تو کر خدمت فقیر و مکی

نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں

‘অন্তরে দরদ হাসিল করিতে হইলে ফকীর-দরবেশ আল্লাহওয়ালাদের খেদমত কর, কেননা এই মহামূল্য মণি মুক্তা রাজা-বাদশার ভাণ্ডারেও পাইবে না।’

হযরত ওমর (রাযিঃ) কি কারণে এশার নামাযের পর বাড়িতে গিয়া সকাল পর্যন্ত নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) দিনভর রোযা রাখিতেন এবং সারারাত্র নামাযে কাটাইয়া দিতেন ; শুধু রাত্রের প্রথম অংশে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন। রাত্রে এক এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। ‘শরহে এহইয়া’ কিতাবে আবু তালেব মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চল্লিশজন তাবেয়ী সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত আছে, যে, তাঁহারা এশার নামাযের ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়িতেন। হযরত শাদ্দাদ (রহঃ) রাত্রে শুইতেন আর এপাশ ওপাশ করিতে করিতে সকাল করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ ! আগুনের ভয় আমার ঘুম উড়াইয়া দিয়াছে। হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) রমযান মাসে শুধু মাগরিব ও এশার মাঝখানে সামান্য সময় ঘুমাইতেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইযাব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন। হযরত সিলাহ ইবনে আশায়াম (রহঃ) সারা রাত্র নামায পড়িতেন আর সকালে এই দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট জান্নাত চাহিবার যোগ্য তো নই। শুধু এতটুকু দরখাস্ত করিতেছি যে, আমাকে দোষখের আগুন হইতে বাঁচাইয়া দিন। হযরত কাতাদা (রহঃ) পুরা রমযান মাসে প্রতি তিন রাত্রে কুরআন শরীফ এক খতম করিতেন। আর শেষ দশ দিন প্রতি রাত্রে এক খতম করিতেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন, ইহা এত প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, ইহাকে অস্বীকার করিলে ইতিহাসের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। ইমাম সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি এই শক্তি কিভাবে অর্জন করিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর নামসমূহের তোফায়েলে এক বিশেষ তরিকায় দোয়া করিয়াছিলাম। ইমাম আবু হানীফা

(রহঃ) শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন ; তিনি বলিতেন, হাদীস শরীফে ‘কায়লুলা’ করার কথা এরশাদ হইয়াছে। বস্তুতঃ দুপুরে শোয়ার মধ্যেও সুন্নতের অনুসরণের নিয়ত থাকিত। কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় তিনি এত কাঁদিতেন যে, প্রতিবেশীদেরও দয়া আসিয়া যাইত। একবার **بَلِّ السَّاعَةَ مَوْعِدَهُمُ الْخ** এই আয়াত পড়িতে পড়িতে সারারাত্র কাঁদিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) রমযান মাসে রাত্রেও ঘুমাইতেন না এবং দিনেও ঘুমাইতেন না। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) পুরা রমযান মাসে দিবা-রাত্রির নামাযে ষাটবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। এইগুলি ছাড়াও বুয়ুর্গানে দ্বীনের আরও শত শত ঘটনা রহিয়াছে। তাহারা আল্লাহর বাণী ‘আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি’ ইহার অর্থকে সত্যে পরিণত করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা এবাদত করিতে চায় তাহাদের জন্য এইরূপ এবাদত করা কোন মুশকিল নয়। এই হইল আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের ঘটনাবলী। তবে এবাদতকারী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ববর্তীদের মত মুজাহাদা না হউক ; কিন্তু নিজেদের যমানা ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের নমুনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ফেৎনা-ফাসাদের যুগেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার অনুসরণকারীদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহাদের জন্য আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততা কোনটাই তাহাদের এবাদতের মগ্নতায় বাধা হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ‘হে আদম সন্তান ! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতায় ভরিয়া দিব, তোমার অভাব-অনটন দূর করিয়া দিব। নতুবা তোমার অন্তরকে বিভিন্ন ব্যস্ততার দ্বারা ভরপুর করিয়া দিব এবং তোমার অভাব-অনটনও দূর হইবে না।’ প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনাবলী এই সত্য বাণীর সাক্ষ্য দিতেছে।

(۳) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِئِيلُ فِي بَيْتِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَبْكُونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْلِ مِنَ الْعَشِيرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ (مشكلة)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔

عن البخاری

৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা রমযান মূবারকের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত : বুখারী)

ফায়দা : অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাস ২৯ দিনে হউক বা ৩০ দিনে হউক শেষ দশ দিন একুশতম রাত্র হইতে শুরু হয়। এই হিসাবে উল্লেখিত হাদীস মুতাবিক শবে কদর ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের রাত্রগুলিতে তালাশ করা উচিত। যদি মাস ২৯ দিনেই হয় তবুও এই দিনগুলিকেই শেষ দশদিন বলা হইবে। কিন্তু আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, ‘আশারা’ শব্দের অর্থ হইল দশ। সুতরাং রমযানের চাঁদ যদি ত্রিশা হয় তবে তা একুশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত দিনগুলিকে শেষ দশ দিন বলা হইবে। কিন্তু চাঁদ যদি উনত্রিশা হয় তবে শেষ দশ দিন বিশতম রাত্রি হইতে শুরু হইবে। এই হিসাবে বেজোড় রাত্রি হইবে ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের তালাশে রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। আর এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, উহা একুশতম রাত্রি হইতে শুরু হইত। এইজন্য অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে একুশতম রাত্র হইতে বেজোড় রাত্রগুলিতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ও অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। অবশ্য অন্যান্য রাত্রগুলিতেও শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই উভয় উক্তি অনুযায়ী শবে কদরের তালাশ তখনই সম্ভব হইবে যখন ২০তম রাত্র হইতে ঈদের রাত্র পর্যন্ত প্রতিটি রাত্র জাগিয়া থাকিয়া শবে কদরের ফিকিরে মশগুল থাকিবে। যে ব্যক্তি শবে কদরের সওয়াবের আশা রাখে তাহার জন্য মাত্র দশ এগারটি রাত্র জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়া দেওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।

عُرْفَى الْاَكْبَرِ يُتَشَرَّدُ وَمَالٌ مَدْرَسِلٌ مِيْتَوَالٌ بِرَمْتَا كَرِيْتِن

অর্থ : হে উরফী ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি বন্ধুর মিলন লাভ হয় তবে এই

আশায় শত বৎসরও কাঁদিয়া কাটানো যায়।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى رَجَعْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأَخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى فَتَلَا حَى فَتَلَا حَى وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ وَالْخَامِسَةِ (مشكلة عن البخاری)

حضرت عبادة کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تمہیں اطلاع نہ ہو سکی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو لہذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

৫) হযরত উবাদা (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ জানাইবার জন্য বাহিরে তাশরীফ আনিলেন। এই সময় দুইজন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, আমি তোমাদিগকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল বিধায় নির্দিষ্ট তারিখ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। হয়ত এই উঠাইয়া লওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কোন মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত : বুখারী)

ফায়দা : এই হাদীসে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—সর্বপ্রথম যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল, ঝগড়া কত বড় অনিষ্টকর যে, ইহার জন্যই শবে কদরের তারিখ চিরদিনের জন্য উঠাইয়া লওয়া হইল। শুধু ইহাই নয় বরং ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই বরকত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদিগকে নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদি হইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিব? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন—অবশ্যই বলিয়া দিন। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পরস্পর সদ্ব্যবহার সবচাইতে উত্তম জিনিস। আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদ

দ্বীনকে মুণ্ডাইয়া দেয় অর্থাৎ ক্ষুর দ্বারা যেমন মাথার চুল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়, তেমনিভাবে পারস্পর ঝগড়া-বিবাদে দ্বীনও সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় হইল, দ্বীন সম্পর্কে বেখবর অর্থাৎ দুনিয়াদার লোকদের কথা বাদই দিলাম বহু লম্বা লম্বা তসবীহ পাঠকারী, দ্বীনদারীর দাবীদার লোকেরাও সর্বদা পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকে। তাই প্রথমে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন অতঃপর নিজের সেই দ্বীনদারীর বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহার অহংকারে (এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে) ঝগড়া মিটাইবার জন্য নত হওয়ার তওফীক হয় না। প্রথম পরিচ্ছেদে রোযার আদবের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের ইয্যত নষ্ট করাকে সবচাইতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য সুদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমন তুমুল ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত যে, না কোন মুসলমানের ইয্যত-সম্মানের খাতির করি, না আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর কোন পরওয়া করি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ۖ الْأَيَةُ অর্থাৎ তোমরা পরস্পর কলহ-বিবাদ করিও না। অন্যথা হিম্মতহারা হইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে।’ (সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৬) যাহারা সবসময় অপরের ইয্যত নষ্ট করার চিন্তায় লিপ্ত থাকে তাহাদের একটু নিরবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, ইহার দ্বারা তাহারা স্বয়ং নিজেদের মান-সম্মানের উপর কত বড় আঘাত হানিতেছে। উপরন্তু নিজেদের এই নাপাক ও নিকৃষ্ট কর্মের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিতে কত অপদস্থ হইতেছে; ইহা ছাড়া দুনিয়ার যিগ্মতি তো আছেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে আর এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে সোজা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দাদের আমল পেশ করা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা রহমতের দ্বারা (নেক আমলসমূহের বদৌলতে) মুশরিক ব্যতীত অন্যদেরকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থাকে তাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হয় যে, তাহাদের পরস্পর সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখ। অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হয়। এই সময় তওবাকারীদের তওবা ও

এস্তেগফারকারীদের এস্তেগফার কবুল করা হয়। কিন্তু পরস্পর ঝগড়া-কলহকারীদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক হাদীসে আছে, শবে বরাতে আল্লাহ তায়ালা রহমত ব্যাপকভাবে সকলের দিকে রুজু হয় এবং সামান্য সামান্য বাহানায় ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না—এক কাফের, দুই যে অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের নামায কবুল হওয়ার জন্য তাহাদের মাথার আধা হাত উপরেও উঠে না। তন্মধ্যে তাহাদের পরস্পর কলহ-বিবাদকারীদের কথাও বলিয়াছেন।

এখানে এই বিষয়ের সমস্ত হাদীস একত্র করার অবকাশ নাই। তবে কিছু হাদীস এইজন্য উল্লেখ করা হইল যে, বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো বটেই বরং যাহারা খাছ লোক, যাহাদেরকে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলা হয় এবং দ্বীনদার মনে করা হয় তাহাদের মজলিস, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিও এই হীনকর্ম দ্বারা ভরপুর থাকে। আল্লাহর দরবারেই অভিযোগ করি এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

উপরোক্ত আলোচনার পর এখানে আরও একটি কথা জানা দরকার যে, এইসব ঝগড়া-বিবাদ ও দুশমনী তখনই নিন্দিত হইবে যখন উহা দুনিয়ার জন্য হইবে। আর যদি কাহারও গোনাহের কারণে কিংবা কোন দ্বীনী কাজের খাতিরে কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তবে উহা জায়েয আছে। একবার হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তাঁহার ছেলে এমন একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন যাহার দ্বারা বাহ্যতঃ হাদীসের উপর আপত্তি মনে হইতেছিল। এই কারণে হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) মৃত্যু পর্যন্ত ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর জীবনে এই ধরনের আরও বহু ঘটনা পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন-দেখেন, তিনি অন্তর্যামী। অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, কে দ্বীনের খাতিরে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে আর কে নিজের অহংকার ও বড়াই প্রকাশের জন্য করিয়াছে। নতুবা প্রত্যেকেই দ্বীনের খাতিরে দুশমনী করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারে।

উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গিয়াছে তাহা হইল, হেকমতে এলাহীর সামনে পুরাপুরিভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ তায়ালা যে কোন হুকুমকে গ্রহণ করিয়া লওয়া ও উহার প্রতি

আত্মসমর্পণ করা চাই। কেননা শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি উঠিয়া যাওয়া বাহ্যত একটি বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়া মনে হইলেও যেহেতু উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘটিয়াছে, কাজেই হৃদয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, হয়ত ইহাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে। অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি সর্বদাই মেহেরবান ও অনুগ্রহশীল। কোন পাপের কারণে বান্দা যদি মুসীবতে পড়িয়া যায় অতঃপর সে আল্লাহর দিকে সামান্যও রুজু হয় ও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে, তবে মহান আল্লাহর দয়া তাহাকে ঘিরিয়া লয় এবং সেই মুসীবতকেও তাহার জন্য বড় কল্যাণের কারণ বানাইয়া দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালা জন্য কোন কিছুই মুশকিল নয়।

অতএব, শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকার মধ্যেও বেশ কিছু হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করিয়াছেন।

এক শবে কদর নির্দিষ্ট থাকিলে অনেক দুর্বল মনের লোক এমন হইত যাহারা অন্যান্য রাত্রের এবাদত একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিত। বর্তমান অবস্থায় আজই শবে কদর হইতে পারে এই সম্ভাবনায় অনুসন্ধানকারীদের জন্য বিভিন্ন রাত্রে এবাদত করার তওফীক নসীব হইয়া যায়।

দুই অনেক মানুষ এমন আছে যাহারা গোনাহ না করিয়া থাকিতেই পারে না। শবে কদর নির্দিষ্ট হইলে ঐ নির্দিষ্ট রাত্র জানা থাকার পরও যদি গোনাহের দুঃসাহস করিত তবে তাহারা নিশ্চিত ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ আনার পর দেখিলেন যে, জনৈক সাহাবী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। হৃদয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি তাহাকে জাগাইয়া দাও যেন সে ওযু করিয়া নেয়। হযরত আলী (রাযিঃ) লোকটিকে জাগাইবার পর হৃদয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নেক কাজে তো আপনি খুবই দ্রুত আগাইয়া যান কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি নিজে তাহাকে জাগাইলেন না কেন? হৃদয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি জাগাইতে গেলে (ঘুমের ঘোরে) হয়ত সে অস্বীকার করিয়া বসিত। আর আমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে তোমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করিলেন না যে, এই মহান মর্যাদাবান রাত্রটির

কথা জানার পর কোন বান্দা উহাতে গোনাহের দুঃসাহস করুক।

তিন শবে কদর নির্দিষ্ট থাকিলে যদি ঘটনাক্রমে কাহারও এই রাত্রি ছুটিয়া যাইত, তবে মনোকষ্টের দরুন তাহার জন্য আর কোন রাত্র জাগরণই নসীব হইত না। এখন তো অন্তত রমযানের দুই একটি রাত্র জাগা সকলের ভাগ্যে জুটিয়াই যায়।

চার যতগুলি রাত্র শবে কদরের তালাশে জাগিয়া থাকিবে প্রত্যেকটির জন্যই পৃথক পৃথক সওয়াব লাভ করিবে।

পাঁচ পূর্বে এক রেওয়াযাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রমযানের এবাদতের উপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া থাকেন। শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকা অবস্থায় গর্ব করার সুযোগ বেশী হয়। কেননা, তারিখ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বান্দা রাত্রের পর রাত্র জাগিয়া এবাদতে মশগুল হইয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইত যে, এই রাত্রই শবে কদর, তবে কি তাহারা এত রাত্র জাগ্রত থাকিয়া এবাদত করিতে চেষ্টা করিত?

এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য কল্যাণও থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এই সব কারণে আল্লাহ তায়ালা বিধান এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে যে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তিনি গোপন করিয়া রাখেন। যেমন ইস্মে আজমকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এমনিভাবে জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার খাছ ওয়াজ্বকেও গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অনুরূপভাবে আরও বহু বিষয়ই তিনি গোপন রাখিয়া দিয়াছেন। অবশ্য এখানে ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ঝগড়ার কারণে শুধুমাত্র সেই রমযানেই শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর উল্লেখিত অন্যান্য হেকমত ও কল্যাণের কারণে চিরদিনের জন্যই অনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি এই পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে তাহা এই যে, শবে কদর নবম, সপ্তম ও পঞ্চম এই তিনটি রাত্রে তালাশ করিতে বলা হইয়াছে। অন্যান্য রেওয়াযাত মিলাইলে এইটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, এই তিনটি রাত্রই শেষ দশকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারপরও আরও কয়েকটি সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, শেষ দশ দিনকে যদি শুরু হইতে গণনা করা হয় তবে হাদীসের অর্থ ২৯, ২৭ ও ২৫তম রাত্রি হয়। আর যদি শেষ দিক হইতে গণনা করা হয় যেমন হাদীসের কোন কোন শব্দের দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় এবং চাঁদ উনত্রিশ হয় তবে ২১, ২৩ ও ২৫তম রাত্রি হইবে। পক্ষান্তরে চাঁদ ত্রিশ হইলে তিন রাত্রি ২২, ২৪ ও

২৬তম রাত্রি হইবে।

ইহা ছাড়াও শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের রেওয়াজাত রহিয়াছে। আর এই কারণেই ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের প্রায় ৫০টির মত উক্তি রহিয়াছে। অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে রেওয়াজাতের মধ্যে এত বেশী পার্থক্যের কারণ এই যে, এই রাত্রিটিকে কোনো বিশেষ তারিখের সহিত নির্দিষ্ট নয়। বরং বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন রাত্রে হইয়া থাকে। এ কারণেই রেওয়াজাতও বিভিন্ন রকম আসিয়াছে। অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বৎসর ঐ বৎসরেরই বিভিন্ন রাত্রে তালাশ করার হুকুম করিয়াছেন। আবার কোন কোন বৎসর নির্দিষ্ট করিয়াও বলিয়াছেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর এক রেওয়াজাতে আছে যে, একদা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে শবে কদরের আলোচনা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আজ কোন তারিখ? আরজ করা হইল, আজ ২২ তারিখ। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রেই তালাশ কর। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, শবে কদর কি শুধু নবীর যমানাতেই হইয়া থাকে, নাকি তাঁহার পরেও হয়? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, উহা কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, উহা রমযানের কোন অংশে হয়? তিনি বলিলেন, প্রথম ও শেষ দশকে উহা তালাশ কর। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য প্রসঙ্গে কথা বলিতে শুরু করিলেন। পরে আমি সুযোগ বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতটুকু তো বলিয়া দিন যে শবে কদর দশকের কোন অংশে হয়। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি এত বেশী নারাজ হইলেন যে, ইহার পূর্বে বা পরে তিনি আমার প্রতি আর কখনও এত নারাজ হন নাই। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যদি ইহা মজী হইত তবে জানাইয়া দিতেন। শেষের সাত রাত্রিতে উহা তালাশ কর। অতঃপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

জনৈক সাহাবীকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩তম রাত্রির কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একরাত্রে আমি ঘুমাতে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে কেউ বলিল যে, উঠ! আজ শবে কদর। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম হইতে উঠিয়া হযরত নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিতেছিলেন। আর এই রাত্রিটি ছিল ২৩তম রাত্রি। কোন কোন রেওয়াজাত দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ২৪তম রাত্রির কথাও জানা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বৎসর রাত্রি জাগরণ করিবে, সে শবে কদর পাইবে। অর্থাৎ শবে কদর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই আসিয়া থাকে। কেহ ইবনে কা'ব (রাযিঃ)কে ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর এই কথা নকল করিয়া শুনাইলে তিনি বলিলেন যে, ইহার দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন একরাত্রির উপর ভরসা করিয়া বসিয়া না থাকে। অতঃপর তিনি কসম খাইয়া বলিলেন যে, কদর রমযানের ২৭তম রাত্রিতে হইয়া থাকে। এমনিভাবে অনেক সাহাবী (রাযিঃ) ও তাবেরের মতে ২৭তম রাত্রিতেই কদর হয়। ইহাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর অভিমত হইল, যে ব্যক্তি সারা বৎসর জাগিয়া থাকিবে সেই উহা পাইতে পারে। 'দুররে মানসূর' কিতাবের এক রেওয়াজাত দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এরূপই রেওয়াজাত বর্ণনা করেন। ইমামগণের মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ মত হইল যে, উহা সারা বৎসরই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর দ্বিতীয় অভিমত হইল উহা পুরা রমযানে ঘুরিতে থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মত হইল, উহা রমযান মাসের কোন এক রাত্রে আসে—যাহা নির্দিষ্ট ; কিন্তু আমাদের জানা নেই। শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণের জোরদার মত হইল, উহা ২১তম রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর অভিমত হইল উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে আসে। একেক বৎসর একেক তারিখে হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ২৭তম রাত্রিতেই উহার বেশী আশা করা যায়। শায়খুল আরেফীন মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ঐসব লোকের অভিমতই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয় যাহারা বলেন যে, উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই আসিয়া থাকে। কেননা, আমি শাবান মাসে উহা দুইবার দেখিয়াছি। একবার ১৫ তারিখে আরেক বার ১৯ তারিখে। আর দুইবার রমযান মাসের মধ্য দশকের ১৩ ও ১৮ তারিখে দেখিয়াছি। এছাড়া রমযান মাসের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রিগুলিতেও দেখিয়াছি। তাই আমার একীণ হইল যে, উহা বৎসরের সকল রাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া থাকে। তবে

کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ بچنے سے روک دیا بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔

৬) উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এরশাদ ফরমান যে, উহা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখে বা রমযানের শেষ রাত্রে হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ় একীনের সহিত সওয়াবের আশায় এই রাত্রে এবাদতে মশগুল হয়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। এই রাত্রের অন্যান্য আলামতের মধ্যে একটি হইল, এই রাত্রিটি নির্মল ঝলমলে হইবে, নিঝুম, নিথর—না অধিক গরম, না অধিক ঠাণ্ডা ; বরং মধ্যম ধরনের হইবে। (নূরের আধিক্যের কারণে) চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রের ন্যায় মনে হইবে। এই রাত্রে সকাল পর্যন্ত শয়তানের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। উহার আরো একটি আলামত এই যে, পরদিন সকালে সূর্য কিরণবিহীন একেবারে গোলাকার পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উদ্ভিত হয়। আল্লাহ পাক সেইদিনের সূর্যোদয়ের সময় উহার সহিত শয়তানের আত্মপ্রকাশকে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (পক্ষান্তরে অন্যান্য দিন সূর্যোদয়ের সময় সেখানে শয়তান আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।) (দুররে মানসুরঃ আহমদ, বাইহাকী)

ফায়দা : এই হাদীসের প্রথম বিষয়বস্তু তো পূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহেও আসিয়াছে। হাদীসের শেষ অংশে শবে কদরের কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা হইয়াছে। যেগুলির অর্থ ও মতলব অত্যন্ত পরিষ্কার। কোন প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া আরও কিছু আলামত বিভিন্ন রেওয়ায়াত এবং ঐ সকল লোকদের বর্ণনায় আসিয়াছে, যাহাদের এই পুণ্যময় রজনীর অফুরন্ত দৌলত নসীব হইয়াছে। বিশেষতঃ এই রাত্রের পর ‘ভোরবেলায় সূর্য কিরণবিহীন উদ্ভিত হয়’ এই কথাটি হাদীসের বহু রেওয়ায়াতে আসিয়াছে এবং এই আলামতটি সর্বদাই পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য আলামত পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। আবদাহ ইবনে আবী লুবাবা (রাযিঃ) বলেন, আমি রমযানের ২৭তম রাত্রিতে সমুদ্রের পানি মুখে দিয়া দেখিয়াছি। উহা সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। আইয়ুব ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হয়, আমি সমুদ্রের পানিতে গোসল করি। এই সময় পানি সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। ইহা রমযানের ২৩তম রাত্রির ঘটনা।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, শবে কদরে প্রতিটি বস্তু সিজদা করে।

এমনকি বৃক্ষসমূহ যমীনের উপর সিজদায় পড়িয়া যায়। আবার নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াইয়া যায়। তবে এই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্তুর সহিত সম্পর্ক রাখে, যে কোন মানুষ অনুভব করিতে পারে না।

حضرت عائشہؓ نے حضورؐ سے پوچھا کہ
یا رسول اللہ! اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل
جاوے تو کیا دعا مانگوں حضورؐ نے اَللّٰهُمَّ
سے اخیر تک دعا بتلائی۔ جس کا ترجمہ یہ
ہے۔ اے اللہ! تو بیشک مُعاف کرنے والا ہے
اور پسند کرتا ہے مُعاف کرنے کو، پس
مُعاف فرما دے مجھ سے بھی۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي كَلْبَةً
أَقْدَرُ مَا أَكُولُ فِيهَا قَالَ تُولَدُ
أَلَلَّهِمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ حَسْبُ الْعَفْوَ عَافُ
عَنِّي (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
ومعهه كذا في المشكوة)

৭ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি যদি শবে কদর পাইয়া যাই, তবে কি দোয়া করিব? ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন—এই দোয়া করিও—

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন।
অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

(মিশকাত : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

ফায়দা : অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ দোয়া ! আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আশ্রিতের জবাবদেহিতা হইতে মুক্তি দিয়া দিলে উহার চাইতে বড় নেয়ামত আর কী হইতে পারে !

من گویم که طاعت پذیر
 قلم عفور بر گناہم کش

অর্থাৎ, আমি এই কথা বলি না যে, আমার এবাদত কবুল কর ; আমার সবিনয় আরজ এই যে, হে আল্লাহ ! আমার সমুদয় গোনাহ-খাতা মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দাও ।

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, এই রাত্রে দোয়ায় মশগুল থাকা অন্য যে কোন এবাদতের চাইতে উত্তম। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, শুধু দোয়া নয় বরং বিভিন্ন প্রকারের এবাদত করাই উত্তম। যেমন নামায, তেলাওয়াত, দোয়া, মুরাকাবা ইত্যাদি। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সবগুলি এবাদতই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কারণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে নামায, যিকির ইত্যাদি কয়েকটি এবাদতেরই বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ এতেকাফের বর্ণনা

এতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে এতেকাফ বলে। হানাফীগণের নিকট এতেকাফ তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার—ওয়াজিব এতেকাফ, যাহা কোন কাজের উপর মান্নত করার কারণে ওয়াজিব হয়। যেমন কেহ বলিল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হইয়া যায়, তবে আমি এতদিন এতেকাফ করিব। অথবা কোন কাজের শর্ত ব্যতীত এমনিতেই এইরূপ মান্নত করিল যে, আমি আমার উপর এতদিনের এতেকাফ জরুরী করিয়া নিলাম। অর্থাৎ আমি অবশ্যই এতদিন এতেকাফ করিব—এইভাবে বলিলেও এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, যতদিনের নিয়ত করিবে ততদিনের এতেকাফ করা জরুরী হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার—সুন্নত এতেকাফ, যাহা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনগুলিতে এতেকাফ করিতেন।

তৃতীয় প্রকার—নফল এতেকাফ, ইহার জন্য কোন সময় বা দিনকাল নির্দিষ্ট নাই। যতক্ষণ বা যতদিন ইচ্ছা করা যাইবে এমনি কি কেহ সারাজীবন এতেকাফের নিয়ত করিলেও জায়েয হইবে। তবে কম সময়ের জন্য এতেকাফের নিয়তের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে একদিনের কম এতেকাফ জায়েয নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে সামান্য সময়ের জন্যও এতেকাফ করা জায়েয আছে। আর এই মতের উপরই ফতওয়া। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিত হইল, যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিবে। তাহা হইলে যতক্ষণ সে নামায ইত্যাদি অন্যান্য এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিবে, ততক্ষণ সে এতেকাফেরও সওয়াব পাইয়া যাইবে।

আমি আমার আব্বাজান (রহঃ) কে সর্বদা এই এহুতেমাম করিতে দেখিয়াছি যে, তিনি যখন মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন তখন ডান পা মসজিদে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিতেন।

খাদেমগণকে তালীম দেওয়ার জন্য কখনও কখনও আওয়াজ করিয়াও নিয়ত করিতেন।

এতেকাফের সওয়াব অনেক বেশী। এতেকাফের ফযীলত ইহার চাইতে বেশী আর কী হইবে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ইহার এহুতেমাম করিতেন। এতেকাফকারীর দৃষ্টান্ত হইল ঐ ব্যক্তির মত যে কাহারও দরজায় গিয়া পড়িয়া রহিল আর বলিতে থাকিল যে, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান হইতে যাইব না।

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی مسرت ہی آرزو ہے

অর্থ : তোমার পদতলে আমার জীবন শেষ হউক—ইহাই আমার হৃদয়ের আকুতি, ইহাই আমার পরম প্রাপ্তি।

প্রকৃতপক্ষেই যদি কাহারও অবস্থা এ—ই হয় তবে চরম নিষ্ঠুর হৃদয়ও না গলিয়া পারে না। আর অসীম দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তো দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করেন। বরং কোন বাহানা ছাড়াই দান করিয়া থাকেন।

تو وہ دانا ہے کہ دینے کے لئے
درزی رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

অর্থ : হে দয়াময়! তুমি তো এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার রহমতের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।

خدا کی دین کا نمونہ سے پوچھے احوال
کہاگ لینے کو جائیں یہ میری مل جائے

অর্থ : আল্লাহর দানের অবস্থা হযরত মুসা (আঃ) কে জিজ্ঞাসা কর। যিনি আগুন আনিতে যাইয়া পয়গাম্বরী পাইয়া গেলেন।

অতএব, কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার যাবতীয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া মহান আল্লাহর দরবারে আছড়াইয়া পড়িবে তখন তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যাপারে কি কোন দ্বিধা থাকিতে পারে! আল্লাহ তায়ালা যখন কাহাকেও দিবেন তখন আল্লাহ তায়ালা ভরপুর খাযানার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য কাহার আছে? ইহা হইতে বেশী বলিতে আমি অক্ষম যে, নাবালগ কি কখনও বালগ হওয়ার স্বাদ বর্ণনা করিতে পারে? তবে হাঁ, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত নিয়া নিবে যেমন কবি বলেন—

جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں
یادہ نفل میں آئے یا جاں نفس سے چھوٹے

অর্থ : যে ফুলকে হৃদয় দিয়াছি, যে ফুলের জন্য আমি কুরবান, সেই ফুল হয়ত হাতে আসিবে; নতুবা জীবন পাখী পিঞ্জর ছিড়িয়া উড়িয়া যাইবে।

ইবনে কায়্যিম (রহঃ) বলেন, এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য এবং উহার প্রাণ হইল, অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার পাক যাতের সহিত এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত করিয়া নেওয়া যে, পার্থিব সকল মোহ ছিন্ন হইয়া আল্লাহ পাকের সহিত মিলিত হইয়া যায়। দুনিয়ার সমস্ত ধ্যান-খেয়ালের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ পাকের ধ্যান-খেয়ালে নিমগ্ন হইয়া যায়। গায়রুল্লাহর সকল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া এমনভাবে আল্লাহর অনন্ত সান্নিধ্যে ডুবিয়া যাইবে যে, সকল চিন্তা-চেতনা ও কল্পনায় একমাত্র তাঁহারই পাক যিকির এবং তাঁহারই মহব্বত প্রবিষ্ট হইয়া যায়। মাখলুকের ভালবাসা বিদূরিত হইয়া শুধু আল্লাহর সুনির্মল ভালবাসাই হৃদয়-মনে সৃষ্টি হইয়া যাইবে। এই ভালবাসাই নির্জন কবরের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কাজে আসিবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ তায়ালার পাক যাত ব্যতীত একান্ত বন্ধু ও সান্ত্বনা দানকারী আর কেহ থাকিবে না। পূর্ব হইতেই যদি তাহার সহিত মনের সম্পর্ক কায়ম হইয়া থাকে তবে সেখানে কি আনন্দ-উপভোগেই না সময় কাটিবে।

جی ڈھونڈتا ہے پھر دی فرمت کے رات دن بیٹھا رہوں تصورِ جاں کے ہوتے

অর্থ : আমার মন সেই সুবর্ণ সুযোগ খুঁজিতেছে, যাহাতে রাত্রিদিন প্রেমাস্পদের ধ্যানে বসিয়া থাকি।

‘মারাকিল ফালাহ’এর গ্রন্থকার বলেন, এতেকাফ যদি এখলাসের সহিত হয় তবে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। উহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনাযুক্ত। কারণ, ইহাতে সংসার জগতের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন করা হয়। স্বীয় নফসকে মাওলা পাকের হাতে সোপদ করিয়া দিয়া মনিবের দ্বারা পড়িয়া থাকা হয়।

پھر جی میں ہے کہ درپے کسی کے پڑا رہوں سرزیرِ بارِ منتِ درباں کے ہوتے

অর্থ : আবার মন চায়, দারোয়ানের দয়ার বোঝা মাথায় লইয়া কাহারো দ্বারা পড়িয়া থাকি।

তদুপরি উহাতে সবসময় এবাদতে মগ্ন থাকা হয়। কেননা, এতেকাফকারীকে ঘুমন্ত জাগ্রত সর্বাবস্থায় এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হয় ; এইভাবে সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য বিদ্যমান থাকে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—‘যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।’

ইহা ছাড়াও এতেকাফে আল্লাহর ঘরে অবস্থান করা হয় এবং দয়ালু মেজবান সর্বদা নিজ মেহমানের সম্মান করিয়াই থাকেন। সর্বোপরি, এতেকাফকারী আল্লাহর দূর্গে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে যেখানে শত্রু প্রবেশ করিতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের আরও অসংখ্য ফাযায়েল ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

মাসআলা : পুরুষের জন্য এতেকাফের সর্বোত্তম স্থান হইল মসজিদ মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, তারপর মদীনার মসজিদে নববী, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। অতঃপর জামে মসজিদ, অতঃপর স্থানীয় মহল্লার মসজিদ। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মতে এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হওয়া শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মতে মসজিদ হওয়াই যথেষ্ট। জামাআত না হইলেও এতেকাফের ক্ষতি হইবে না। মহিলাগণ নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে এতেকাফ করিবেন। যদি ঘরে নামাযের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান না থাকে তবে এতেকাফের জন্য কোন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবেন। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এতেকাফ অধিকতর সহজ। কেননা, তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মেয়ে বা অন্য কাহারও দ্বারা সংসারের কাজকর্মও করাইতে পারেন, আবার অনায়াসে এতেকাফের সওয়াবও হাসিল করিতে পারেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহিলাগণ এই সুন্নত হইতে প্রায় বঞ্চিতই থাকিয়া যান।

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسَكَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اِغْتَسَكَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِي قُبَّةِ تَرْجِيَّةٍ ثُمَّ اُطْلِعَ رَأْسُهُ فَقَالَ إِنِّي اِغْتَسَكْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ النَّوَسُ مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ثُمَّ اِغْتَسَكْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُرْتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اِغْتَسَكَ مَعِيَ فَلْيَغْتَسِبِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَقَدْ اُرْتَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی پھر ترکی غیمہ سے جس میں اونگت فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شریف کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلنے والے (یعنی فرشتہ) نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں

୧୫୫

୩୫୩

بیہانہ مے و ہر بہانے و ہر

اس کے اَلطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَانُ مَعْتَكِفًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَلَمُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ حَلَسَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا فُلَانُ إِنَّكَ مُكْتَبٍ أَحْنِيْنَا قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ عَمْرِو رَسُولِ اللَّهِ فُلَانٌ عَلَنِي حَقٌّ وَلَا وَحَرَمَةَ صَاحِبٍ لِهَذَا

تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں اُٹھ فرمادیتے ہیں جن کی فست آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ (اور جب ایک دن کے اُغٹکاف کی فیضیت ہے تو دس برس کے اُغٹکاف کی کیا کچھ مقرر ہوگی)

হাদীস-৩ : একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মসজিদে নববীতে এতেকাফ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল এবং সালাম করিয়া চুপচাপ বসিয়া পড়িল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি তোমাকে চিন্তিত ও পেরেশান দেখিতেছি! লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসুলের চাচাত ভাই! নিশ্চয়

আমি খুবই চিন্তিত ও পেরেশান। কেননা অমুক ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই কবরওয়ালার ইয্যতের কসম! ঐ ঋণ আদায় করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি তোমার জন্য তাহার নিকট সুপারিশ করিব? লোকটি বলিল, আপনি যাহা ভাল মনে করেন। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ জুতা পরিয়া মসজিদের বাহিরে আসিলেন। লোকটি বলিল, আপনি কি এতেকাফের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না, ভুলি নাই। তবে খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি এই কবরওয়ালার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট শুনিয়াছি (এই কথা বলিবার সময়) ইবনে আব্বাসের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল— তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন কাজে চলাফেরা করিবে এবং চেষ্টা করিবে, উহা তাহার জন্য দশ বছর এতেকাফ করার চাইতেও উত্তম হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন এতেকাফ করে, আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। যাহার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইতেও অধিক। (একদিনের এতেকাফের ফযীলতই যখন এইরূপ তখন দশবছরের এতেকাফের ফযীলত কি পরিমাণ হইবে!)

(তাবারানী, বাইহাকী, হাকিম, তারগীব)

ফায়দা : এই হাদীসের দ্বারা দুইটি বিষয় বুঝা যাইতেছে। এক, একদিনের এতেকাফের সওয়াব হইল, আল্লাহ তায়ালা এতেকাফকারী ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। আর প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী। আর একদিনের অধিক যত বেশীদিনের এতেকাফ হইবে উহার সওয়াবও তত বেশী বাড়িয়া যাইবে। আল্লামা শারানী (রহঃ) ‘কাশফুল গুম্মাহ’ কিতাবে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন এতেকাফ করিবে, সে দুই হজ্জ ও দুই উমরার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়া হয় এমন মসজিদে মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত এতেকাফ করিবে এবং এই সময় কাহারও সহিত কথা না বলিয়া নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জাম্মাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বুঝা যায় তাহা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর

তাহা হইল, কোন মুসলমানের জরুরত পূরা করা। যাহাকে দশ বৎসরের এতেকাফের চাইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। এই জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নিজের এতেকাফের কোন পরওয়ানাই করেন নাই। কারণ, পরবর্তী সময়ে কাজা আদায় করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হইতে পারে। এই কারণেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালা নিকট একটি ভগ্ন হৃদয়ের যে কদর হয় তাহা অন্য কোন জিনিসেরই হয় না। এইজন্যই হাদীস শরীফে মজলুমের বদ-দোয়ার ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহাকেও শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত ইহাও বলিয়া দিতেন যে, সাবধান! মজলুমের বদ-দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : মজলুমের ‘আহ’কে খুবই ভয় কর। কেননা মজলুম যখন দোয়া করে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে কবুলিয়ত আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে।

মাসআলা : এখানে একটি মাসআলার প্রতি লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী। তাহা এই যে, এতেকাফ অবস্থায় কোন মুসলমানের উপকারের জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইলেও এতেকাফ ভাঙ্গিয়া যায়। এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া থাকিলে উহা কাজা করাও ওয়াজিব হইবে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় প্রয়োজন অর্থাৎ প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে মসজিদের বাহিরে যাইতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) অপরের জন্য নিজের এতেকাফ ভাঙ্গ করিয়া যে বিরাট কুরবানী করিলেন, এইরূপ কুরবানী কেবল ঐ সমস্ত মহাপুরুষের জন্য শোভা পায় যাহারা অপরের প্রাণ রক্ষার্থে নিজে তৃষ্ণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করেন; মুখের নিকট পেয়ালা ভর্তি পানি পাইয়াও শুধু এইজন্য পান করেন না যে, তাহার পার্শ্বেই অপর এক আহত ভাই তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে; এই পানি আগে তাহারই প্রয়োজন বেশী।

অবশ্য এখানে এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর এই এতেকাফ নফল এতেকাফ ছিল। তাহা হইলে বিষয়টি সহজ হইয়া যায়। কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھولے
اور مالک جہنم کے دروازے سے فرماتے ہیں
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ
داروں پر جہنم کے دروازے بند کرے اور
جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور
سکڑشیا میں کو قید کرو اور گلے میں
طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے
محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں
کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ
رمضان کی ہر رات میں ایک مٹادی کو
حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے
کہ ہے کوئی مانگے والا جس کو میں عطا کروں
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ
قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا
کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے
جو غنی کو قرض دے ایسا غنی جو نادار نہیں
ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی
نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ حق تعالیٰ
شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار
کیوقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم
سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے
مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا
آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے
آج تک جقدر لوگ جہنم سے آزاد کئے
گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا
جِبْرِيلُ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ
فَاَصْفِدْ مَرَدَّةَ الشَّيَاطِينِ
وَعَلِّمُهُمُ بِالْأَعْلَالِ ثَقَّ
افْزِمْهُمْ فِي الْعِبَادِ حَتَّى
لَا يَصِيدُوا عَلَى أُمَّةٍ مُحْتَدٍ
حَتَّى يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صِيَامَهُمْ قَالَ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ لِمَنَادِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهِ سُؤْلَهُ
هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَقْبُبْ عَلَيْهِ
هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ مَنْ
يَقْرَأُ السُّورَةَ الْكَافِرَةَ وَ
الْوَفَى غَيْرَ الظُّلُمِ قَالَ وَلِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ أَلْفِ
عَلِيٍّ مِنَ النَّارِ كَلَّمَهُمْ قَدْ
اسْتَوْجَبُوا النَّارَ فَإِذَا كَانَ الْاِثْرُ
يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ
اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدَرِ مَا
أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ
وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَا مُرَّ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيلُ فِيهِ لَبِطُ
فِي كِبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ
مَعَهُمُ رُكَاةٌ أَحْصَى فَيَكُونُ الْوَأَوَّلُ

اُخانیہ پریشیٹارپہ اکیٹ سؤدیہ ہادیس ورننا کرریا اہی کیتا و
سماپٹ کرریا دہویا ہہتہ۔ اہی ہادیسہ ویتنن پکار فاہیالے
اُرشاد ہہیالہ۔

ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے
حضور کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت
کو رمضان شریف کے لئے خوشبوؤں کی
دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے
آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ
کیا جاتا ہے پس جب رمضان المبارک کی
پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے
ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مُبَشِّرہ ہے
جس کے چھوٹوں کی وجہ سے جنت کے
درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے
بجھنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آویز مٹری
آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے
اچھی آواز کبھی نہیں سنی پس خوشنما آنکھوں
والی عورتیں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت
کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر
آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بلا
میں ہم سے منگنی کر نیوالا کہ حق تعالیٰ شانہ
اس کو ہم سے جوڑ دیں پھر وہی عورتیں
جنت کے دار و عرضوان سے پوچھتی ہیں
کہ کیسی رات ہے وہ کتنی کبک جواب
دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات
ہے جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت کیلئے (کج) کھول دیئے گئے۔
حضور نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان سے

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُخَرَّوْثُ ثَلَاثِينَ
وَمِنْ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِلْحَوْلِ شَهْرٌ
رَمَضَانَ فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ
مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا
الْمُبَشِّرَةُ فَتَصْفِقُ وَرَقَّ أَشْجَارُ
الْجَنَّةِ وَحَلَقُ الْمَصَارِيعِ فَيَسْمَعُ
لِذَلِكَ طَلِيقٌ لَمْ يَسْمَعْ السَّامِعُونَ
أَحْسَنَ مِنْهُ فَتَبْدَأُ الْحَوَارِ الْعَيْنُ
حَتَّى يَقْنَعَنَّ بَيْنَ شَرَفِ الْجَنَّةِ
فَيَنَادِيَنَّ هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى
اللَّهِ فَيَنْدَجِبُهُ ثُمَّ يَقْلُنَ الْحَوَارِ
الْعَيْنُ يَا رِضْوَانُ الْجَنَّةِ مَا هَذِهِ
الْلَيْلَةُ فَيَجِئُهُنَّ بِالسَّلَامَةِ ثُمَّ
يَقُولُ هَذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ فَتُخَرَّوْثُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
لِلْمَصَائِمِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحْتَدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا رِضْوَانُ
افْتَحْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَيَا مَلَكُ
أَعْلِقِ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ عَنِ
الْمَصَائِمِينَ مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدُ

فَيَقُولُونَ عَلَىٰ أَفْوَهِ السَّكَنِ
فَيَنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ
خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجَنَّ وَ
الْإِنْسُ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
أَخْرَجُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ كَرِيمٍ يُعْطِي
الْجَزِيلَ وَيَقْوَعُونَ الْعَظِيمَ فَإِذَا
بَرَدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ فَيَقُولُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ مَا جَزَاءُ
الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ قَالَ
فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ وَسِّدْنَا
جَزَاءَهُ أَنْ تُوفِّيَهُ أَجْرَهُ قَالَ
فَيَقُولُ فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي
أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ
صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ
فِيهِ لَهُمْ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي وَ
يَقُولُ يَا عِبَادِي سَلُّوْنِي فَوْعَزَتِي
وَجَلَّوْنِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا
فِي جَمْعِكُمْ لِأَخْرَجْتُكُمْ إِلَّا
أَعْطَيْتُكُمْ وَلَا لَدُنِّيَاكُمْ إِلَّا
نَظَرْتُ لَكُمْ فَوْعَزَتِي لَأَسْتُرَنَّ
عَلَيْكُمْ عَثْرَتَكُمْ مَا رَأَيْتُمُونِي
وَعَزَّتِي وَجَلَّوْنِي لَا أَخْزِيكُمْ
وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ
الْحُدُودِ وَأَنْصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ
قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ
فَتَفَرَّحَ الْمَلَكَةُ وَتَشَبَّهَ بِهَا

دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہوا
ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور
ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ
رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرتا ہوا
ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے
تو اس کا نام آسمانوں پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ
کی رات سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح
ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام
شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام
گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے
ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان
کے سوا ہر مخلوق مستحق ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو یم رب کی
(درگاہ) کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرماتا
والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف
فرماتے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف
نکلے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت
فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام
پورا کر چکا ہو، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے
معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے
کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے
تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے
فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان
کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں
اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے
خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو

عَلَىٰ ظَهْرِ الْمَكْعَبَةِ وَكَهْ مَائَةٌ
جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا
إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيَنْشُرُهُمَا
فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيَجَاوِزُ الشَّرْقَ
إِلَى الْمَغْرِبِ فَيَحْتَثُّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِي مِثْلِهِ
اللَّيْلَةِ فَيَسْلِمُونَ عَلَىٰ كُلِّ
قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ
وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى
دُعَائِهِمْ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا
طَلَعَ الْفَجْرُ يَنَادِي جِبْرِيلُ مَعَاذَ
الْمَلَائِكَةِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ فَيَقُولُونَ
يَا جِبْرِيلُ فَمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي
حَوَاجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نَظَرَ
اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا
عَنْهُمْ إِلَّا أَبْكَتَهُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ رَجُلٌ مُدْمِنٌ
خَمْرٍ وَعَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَقَاطِعٌ
رَحِمٍ وَمُشَاحِنٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا الْمُشَاحِنُ قَالَ هُوَ الْمُصَارِمُ
فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سَبَّيْتُ
تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ الْمَسَاكِينِ فَإِذَا
كَانَتْ عِدَّةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ
بَلَدٍ فِيهِ طُغْيَانٌ إِلَى الْأَرْضِ

آزاد فرماتے ہیں اور جس رات شب قدر
ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبریل
کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک
بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں
ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے
جس کو کعبہ کے اوپر کھڑکھڑاتے ہیں اور حضرت
جبریل علیہ السلام کے سوا باہر میں جن میں
سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے
ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک
پھیلا دیتے ہیں پھر حضرت جبریل
فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان
آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ
رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں
اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین
کہیں، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔
جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل ۴ آواز
دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب
کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ
السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے
مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا
معاملہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ
سب کو معاف فرمادیا صحابہ رضی اللہ عنہم
کہ یا رسول اللہ وہ چار شخص کون ہیں ارشاد
ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو

ফেরেশতাগণ হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তায়ালা আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জরুরত ও প্রয়োজন সম্পর্কে কি ফয়সালা করিয়াছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছেন এবং চার ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই চার ব্যক্তি কাহারা? এরশাদ হইল, প্রথম ঐ ব্যক্তি যে মদ পান করে। দ্বিতীয় মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। তৃতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। চতুর্থ বিদ্রোহ পোষণকারী, যে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত্র হয় তখন আসমানে উহাকে পুরস্কারের রাত্র বলিয়া নামকরণ করা হয়। ঈদের দিন সকালে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে প্রত্যেক শহরে পাঠাইয়া দেন। তাহারা জমিনে অবতরণ করিয়া সমস্ত অলিগলি ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া যান এবং এমন আওয়াজে যাহা জিন ও মানব ব্যতীত সকল মখলুকই শুনিতে পায়—ডাকিতে থাকেন যে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত! পরম দয়াময় পরওয়ারদিগারের দরবারে চল। যিনি অপরিণীত দাতা ও বড় হইতে বড় অপরাধ ক্ষমাকারী। অতঃপর লোকেরা যখন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যে মজদুর তাহার কাজ পুরা করিয়াছে সে উহার বিনিময়ে কি পাইতে পারে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে আমাদের মাবুদ আমাদের মালিক! তাহার বিনিময় ইহাই যে, তাহাকে পুরাপুরি পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাদিগকে রমযানের রোযা ও তারাবীর বদলায় আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করিলাম। অতঃপর বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আমার বান্দারা! আমার কাছে চাও। আমার ইযত ও বুয়ুর্গীর কসম, আজকের দিনে ঈদের এই জামাআতে তোমরা আখেরাতের ব্যাপারে যাহা কিছু চাহিবে আমি দান করিব। আর দুনিয়ার বিষয়ে যাহা চাহিবে উহাতে তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গলজনক হইবে তাহাই দান করিব। আমার ইযতের কসম! যতক্ষণ তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ততক্ষণ আমি তোমাদের অপরাধসমূহ গোপন করিতে থাকিব। আমার ইযত ও বুয়ুর্গীর কসম! আমি তোমাদিগকে অপরাধী (অর্থাৎ কাফের)দের সম্মুখে লজ্জিত করিব না। সুতরাং তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমরা আমাকে

রাজী করিয়াছ, আমিও তোমাদের প্রতি রাজী হইয়া গেলাম। ফেরেশতাগণ ঈদের দিন উম্মতের এই আজর ও সওয়াবকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। (তারগীব : বাইহাকী) (হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া নিন, আমীন)

ফায়দা : এই হাদীসের অধিকাংশ বিষয় কিতাবের বিভিন্ন অংশে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে কয়েকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, বেশ কিছু মাহরাম লোক রমযানের সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ পড়িয়াছিল, যেমন পূর্বের হাদীস দ্বারা জানা গিয়াছে। আবার তাহাদিগকে ঈদের এই ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে আত্মকলহকারী ও মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানও রহিয়াছে। তাহাদেরকে কেহ জিজ্ঞাসা করুক যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোমরা নিজের জন্য কোন্ ঠিকানা তালাশ করিয়া লইয়াছ? আফসোস তোমাদের উপর এবং তোমাদের সেই মান-সম্মানের উপর, যাহা হাসিল করিবার অবাস্তব খেয়ালে তোমরা আল্লাহর রাসূলের বদদোয়া মাথায় লইতেছ। জিবরাঈল (আঃ)এর বদদোয়া বহন করিতেছ। আল্লাহর ব্যাপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা হইতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আজ না হয় তোমরা নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়াই দিলে আর নিজের গোঁফ উঁচা করিয়াই লইলে কিন্তু ইহা কতদিন থাকিবে? কারণ, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের প্রতি লানত করিতেছেন, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা তোমাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করিতেছেন, স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও মাগফিরাত হইতে তোমাদেরকে বঞ্চিত করিয়া দিতেছেন। অতএব, একটু চিন্তা কর এবং ক্ষান্ত হও। এখনও সময় আছে ক্ষতিপূরণ সম্ভব। সকালের পথহারা পথিক বিকালে ঘরে পৌঁছিয়া গেলে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু কাল যখন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে তোমাকে হাজিরি দিতে হইবে তখন মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই কাজে আসিবে না। সেখানে শুধু তোমার আমলেরই মূল্য হইবে। তোমার প্রত্যেকটি কাজ সেখানে লিখিত দেখিতে পাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিজের হকসমূহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট হইলে উহার বদলা না দেওয়াইয়া ছাড়িবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল লইয়া উঠিবে; নামায,

রোযা, সদকা সব নেক আমলই তাহার সাথে থাকিবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও বা অপবাদ দিয়াছিল, অথবা কাহাকেও মারপিট করিয়াছিল। তখন এই সকল দাবীদারগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নিজ নিজ দাবী অনুযায়ী তাহার নেক আমলসমূহ হইতে উসূল করিয়া লইয়া যাইবে। এইভাবে যখন তাহার সমস্ত নেক আমল শেষ হইয়া যাইবে তখন দাবীদারগণ নিজেদের গোনাহসমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া যাইবে। তখন সে এই সমস্ত গোনাহ মাথায় লইয়া জাহান্নামে চালিয়া যাইবে। বিশাল নেক আমলের অধিকারী হইয়াও তখন তাহার যে দুঃখজনক পরিণতি হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وہ بالوسنمت کیوں نہ سوتے آسمان دیکھے
کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت آئیگاں دیکھے

অর্থাৎ, জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের পরিশ্রমকে পণ্ড হইতে দেখিয়া হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আকাশ পানে চাহিবে না তো কি করিবে?

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, এই কিতাবে গোনা-মাফীর কয়েকটি স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু বিষয় আছে, যাহা গোনা-মাফীর কারণ হইয়া থাকে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, একবার যখন গোনাহ মাফ হইয়া যায় তখন পুনরায় আবার গোনাহ মাফ হওয়ার অর্থ কি? ইহার জওয়াব এই যে, মাগফেরাত ও গোনা-মাফীর নিয়ম হইল, আল্লাহর মাগফেরাত যখন বান্দার প্রতি রুজু হয় তখন তাহার কোন গোনাহ থাকিলে উহাকে মিটাইয়া দেয়। আর যদি কোন গোনাহ না থাকে তবে সেই পরিমাণ আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

তৃতীয় বিষয় হইল, উপরোক্ত হাদীসে এবং পূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলির মধ্যেও কয়েক জায়গায় এই কথা আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার সময় ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, কিয়ামতের আদালতের বিষয়গুলি নিয়মনীতির উপর রাখা হইয়াছে। নবীদের নিকট হইতে তাহাদের তবলীগের ব্যাপারেও সাক্ষী তলব করা হইবে। বহু হাদীসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং আমি যে পৌছাইয়াছি, সে বিষয়ে তোমরা সাক্ষী থাকিও।

বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন

হযরত নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি কি নবুওয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন? আমার হুকুম আহকাম পৌছাইয়াছিলেন? তিনি আরজ করিবেন, হাঁ, পৌছাইয়াছিলাম। অতঃপর তাহার উম্মতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি কি হুকুম-আহকাম পৌছাইয়াছিলেন? তাহার উম্মত বলিবে لَا بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ

অর্থ : আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে, না কোন ভয়প্রদর্শনকারী আসিয়াছে। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ১৯)

তখন হযরত নূহ (আঃ)কে বলা হইবে, আপনার সাক্ষী পেশ করুন। তিনি তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার উম্মতকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করিবেন। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে ডাকা হইবে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন রেওয়াযাতে আছে, তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে জেরা করা হইবে এবং বলা হইবে যে, নূহ (আঃ) তাহার উম্মতকে আহকাম পৌছাইয়াছেন তাহা তোমরা কিভাবে জানিলে? তখন উম্মতে মুহাম্মদী আরজ করিবে যে, আমাদের রাসূল এই খবর দিয়াছেন; আমাদের নবীর উপর যে সত্য কিতাব নাযিল হইয়াছিল উহাতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে অন্যান্য নবীর উম্মতের সঙ্গেও এরূপ ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করিয়াছেন—

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

অর্থ : এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী উম্মতরূপে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হইতে পার।

(সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৪৩)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন চার প্রকার সাক্ষী হইবে :

প্রথম সাক্ষী ফেরেশতাগণ, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আলোচনা করা হইয়াছে—

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِمَ يُفْتَنُ كَرَامًا كَاتِبِينَ يُكْتُبُونَ مَا تَفْعَلُونَ

(সূরা ইনফিতার, আয়াত : ৯০)

مَا لِيُفْتَنَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۚ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ مَا سَعَتْ وَتُسَبِّحُ

(সূরা ক্বাফ, আয়াত : ১৮/২১)

দ্বিতীয় সাক্ষী আশ্বিয়ায়ে কেলাম, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে

এরশাদ হইয়াছে—

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

(সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ১১৭)

كَفَيْتَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

(সূরা নিসা, আয়াত : ৪১)

তৃতীয় সাক্ষী উম্মতে মুহাম্মদী। যাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে—

وَجِئْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالشُّهُدَاءِ

(সূরা যুমার, আয়াত : ৬৯)

চতুর্থ সাক্ষী মানুষের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي الشُّهُوبِ

(সূরা নূর, আয়াত : ২৪)

أَلَيْسَ اللَّهُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

সংক্ষেপকরণের উদ্দেশ্যে তরজমা লেখা হইল না। তবে সারকথা হইল, আয়াতের শুরুতে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে কিয়ামতের দিন তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথাই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ বিষয় হইল এই হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, ‘আমি কাফেরদের সম্মুখে তোমাদিগকে লজ্জিত করিব না।’ ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অসীম দয়া ও অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের অবস্থার উপর তাঁহার গায়রত যে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাহাদের গোনাহ কিয়ামত দিবসেও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং গোপন করিয়া রাখা হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক একজন মুমিনকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া তাহার উপর পর্দা ফেলিয়া দিবেন, যাহাতে আর কেহ দেখিতে না পায়। অতঃপর তাহার যাবতীয় অন্যায় অপরাধ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার স্বীকারোক্তি লইবেন। সে তখন নিজের গোনাহের বিশাল স্তূপ এবং নিজের স্বীকারোক্তির কথা চিন্তা করিয়া ধারণা করিবে যে, আমার ধ্বংসের সময় অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তখন এরশাদ হইবে, আমি দুনিয়াতেও তোমার অপরাধ গোপন করিয়া রাখিয়াছি। আজ এখানেও সেইগুলি গোপন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর তাহার নেক আমলের দপ্তর তাহাকে দিয়া দেওয়া হইবে।

এইরূপ আরও অসংখ্য রেওয়ায়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়

যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশকারী এবং পাবন্দির সহিত তাঁহার হুকুম-আহকাম পালনকারীর গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এই বিষয়টি বুঝিয়া লওয়া উচিত, যাহারা আল্লাহওয়ালাদের কোন ভুল-ত্রুটির কারণে তাহাদের গীবতে লিপ্ত হইয়া যায় তাহারা যেন এই বিষয়টি মনে রাখে যে, হয়ত কিয়ামতের দিন নেক আমলসমূহের বরকতে তাহাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে আর তোমাদের আমলনামা গীবতের দপ্তর হইয়া নিজেদেরই ধ্বংসের কারণ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন।

পঞ্চম যে জরুরী বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল, ঈদের রাত্রটিকে পুরস্কারের রাত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। এই রাত্রে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে বান্দাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই এই রাত্রিরও বিশেষ কদর করা উচিত। সাধারণ লোক তো দূরের কথা অনেক খাছ লোকও রমযানের ক্লাস্তির পর সেই রাত্রে সুখের নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়ে। অথচ ইহাও বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার রাত্র। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া এবাদতে মগ্ন হইবে, তাহার অন্তর সেইদিন মরিবে না যেদিন সকল অন্তর মরিয়া যাইবে। অর্থাৎ, ফেৎনা-ফাসাদের সময় যখন মানুষের অন্তরের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা ছাইয়া যাইবে তখন তাহার অন্তর সতেজ ও জিন্দা থাকিবে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, এই দিনের দ্বারা শিংগায় ফুৎকারের দিনকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, সেই দিন সকল আত্মা বেহুঁশ হইলেও তাহার আত্মা বেহুঁশ হইবে না।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্যে পাঁচটি রাত্র জাগ্রত থাকিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। সেই রাত্রগুলি হইল—যিলহজ্জের আট, নয় ও দশ তারিখের রাত্র, ঈদুল ফিতির ও পনরই শাবানের রাত্র।

ফুকাহায়ে কেরামও দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকাকে সুন্নত লিখিয়াছেন। ‘মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ’ কিতাবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর অভিমত লেখা হইয়াছে যে, পাঁচটি রাত্রে দোয়া কবুল হয়। জুমআর রাত্রে, দুই ঈদের রাত্রে, রজবের প্রথম রাত্রে এবং শাবানের পনর তারিখ অর্থাৎ শবে বরাতে।

পরিশেষে পাঠকদের খেদমতে আবেদন এই যে, রম্যানের বিশেষ সময়গুলিতে আপনারা যখন নিজেদের জন্য দোয়া করিবেন তখন এই অধম গোনাহগারকেও আপনাদের দোয়ায় शामिल করিয়া লইবেন। হইতে পারে পরম দয়ালু মাওলা পাক আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ার বরকতে আমাকেও আপন সন্তুষ্টি ও মহব্বত দ্বারা আপ্নত করিবেন।



مگر چہ میں بدکار و نالائق ہوں لے شاہ جہاں
پرتزے در کو بتا اب چھوڑ کر جادوں کہاں
کون ہے تیرے سوا مجھ لے لوار کے واسطے
دیکھ منت میرے عمل کا رُطف پر اپنے نگاہ
یارب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے
چرخ عصیاں سر پہ ہے زیرِ قدم بحسبِ الم
کچھ رہائی کا سبب اس بتلا کے واسطے
ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے
ہے عصائے آہ مجھ لے دستِ ہا کے واسطے
نئے فقیری چاہتا ہوں نہ میری کی طلب
نئے عبادت نے ورع نے خواہشِ علم و ادب
درِ دہل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے
عقل نہ ہوش و فکر اور نعمائے دنیا بے شمار
کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار
بخش وہ نعمت جو کام آئے سدا کے واسطے
حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ نہاں کا
کرمِ مری امداد اللہ، وقت ہے امداد کا
اپنے لطف و رحمت لے انتہا کے واسطے

گو میں ہوں اک بندۂ غلامی غلام پُر قصور
تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں لے پُشیمو
نجرم میرا وصل ہے، نام ہے تیرا غفور
اَنْتَ شَافِیْ اَنْتَ کَافٍ فِیْ مُہِمَّاتِ الْاُمُوْر
اَنْتَ حَسْبِیْ اَنْتَ رِجْئِیْ اَنْتَ لِیْ نَعُوْذُ کُلُّ

হে আমার রব! নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। আমার আমল তুমি দেখিও না। আমার উপর দয়া, দান ও অনুগ্রহের জন্য তোমার রহমতের প্রতি দৃষ্টি কর।

এবাদতকারীদের জন্য এবাদতের ভরসা রহিয়াছে এবং যাহেদগণের জন্য যুহদের ভরসা রহিয়াছে। আর আমি হাত-পাৰিহীন পঙ্গুর লাঠি হইল শুধু আহু ও আফসোস।

বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা আরও অসংখ্য পার্থিব নেয়ামত তুমি আমাকে দিয়াছ। এখন হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে ঐ নেয়ামত দান কর যাহা চিরকালের জন্য কাজে আসে।

হে মহান প্রতিদানকারী ! যদিও আমি গোনাহগার বান্দা, দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ গোলাম ; অপরাধ করা আমার দুঃসাহস কিন্তু তোমার নাম গাফুর ; যেমনই হই না কেন আমি তো তোমারই। তুমি আরোগ্য দানকারী, তুমি যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি আমার রব, তুমি আমার জন্য কতই না উত্তম সাহায্যকারী।’

মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী
মাজাহিরে উলূম, সাহারানপুর
২৭শে রমযান রাত্র ১৩৪৯ হিঃ

পাক্ষী কা
ওয়াহেদ এলাজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ভূমিকা

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহঃ)এর বিশেষ অনুরাগ ও গভীর আগ্রহে এবং অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে উস্মতের তাওয়াজ্জুহ, বরকত ও সক্রিয় চেষ্টা-সাধনায় কিছুকাল যাবত দ্বীনের তবলীগ ও ইসলাম প্রচারের কাজ বিশেষ নিয়মে একাধারে চলিয়া আসিতেছে, যাহা সম্পর্কে সচেতন মহল ভালভাবে অবগত আছেন।

আমার মত বে-এলেম ও গোনাহগারের প্রতি ঐ সকল নেক ব্যক্তিবর্গের হুকুম হইয়াছে যে, তবলীগের এই পদ্ধতি এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে বিষয়টি বুঝিতে ও বুঝাইতে সহজ হয় এবং উপকারিতাও ব্যাপক হইয়া যায়।

নির্দেশ পালনার্থে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যাহা ঐ সমস্ত নেক ব্যক্তিবর্গের এলেম ও জ্ঞান সমুদ্রের কয়েকটি ফোঁটা মাত্র এবং দ্বীনে মুহাম্মদীর ঐ বাগানের কয়েকটি গুচ্ছ মাত্র যাহা অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে। যদি ইহাতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে ইহা আমার দুর্বল লেখনী ও অজ্ঞতার কারণে হইয়াছে। মেহেরবানী ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে উহা সংশোধন করিয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমার বদ আমল ও গোনাহসমূহ গোপন রাখুন এবং আমাকে ও আপনাদিগকে ঐ সকল নেক ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় নেক আমল ও নেক আখলাকের তওফীক দান করুন, আপন সন্তুষ্টি ও মহব্বত এবং তাঁহার মনোনীত দ্বীনের প্রচার ও তাঁহার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণের তওফীক দান করিয়া সম্মানিত করুন, আমীন।

আরজ-গুজার

বুয়ুর্গানের পদধূলি

মুহাম্মদ এহুতেশামুল হাসান

১৮ রবীউসসানী ১৩৫৮

মাদরাসা কাশিফুল-উলূম

বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া

দিল্লী (ভারত)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخِرِينَ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ-

আজ হইতে প্রায় সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বে দুনিয়া যখন কুফর ও গোমরাহী, মূর্থতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন মক্কার প্রান্তরময় পর্বতমালা হইতে সত্য ও হেদায়াতের চন্দ্র উদিত হয় এবং পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ—এক কথায় দুনিয়ার সকল প্রান্তকে স্বীয় নূর দ্বারা আলোকিত করে এবং তেইশ বছরের সময়ের মধ্যে মানবজাতিকে উন্নতির ঐ স্তরে পৌছাইয়া দেয়, যাহার নজীর পেশ করিতে গোটা জগতের ইতিহাস অক্ষম। সত্য, হেদায়াত, কল্যাণ ও কামিয়াবীর এমনি মশাল মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেয় যাহার আলোতে মুসলমানগণ উন্নতির রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শত শত বৎসর ধরিয়া এমন জাঁকজমকের সহিত দুনিয়ার বুক রাজত্ব করে যে, সকল বিরোধী শক্তিকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ইহা একটি অনস্বীকার্য বাস্তব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি পুরাতন কাহিনী যাহার বারবার আলোচনা না সান্ত্বনাদায়ক, আর না কোনরূপ উপকারী ও লাভজনক। কারণ বর্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলী স্বয়ং আমাদের অতীত ইতিহাস ও আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কৃতিত্বের উপর কলঙ্কের দাগ লাগাইতেছে।

মুসলমানদের তের শত বৎসরের জীবনকে যখন ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় তখন জানা যায় যে, আমরা ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব, শান ও শওকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির একমাত্র মালিক ও একচ্ছত্র অধিকারী ছিলাম। কিন্তু যখন ইতিহাসের পাতা হইতে নজর সরাইয়া বর্তমান অবস্থার উপর

دُشْتِپات کرا ہئ تখন آمادیگکے چرم لالچیت و اپدسٹ، نیسٹ و اذابگرست جاتی ہسابعے دےخیتے پاویا یای۔ نا آخے شکتی-سامرث، نا آخے دن-دولت، نا آخے شان-شوکت، نا آخے پرستپر آتتھ بکن و بالباسا، نا سذاب بال، نا آخالاک بال، نا آمال بال، نا آچار-آچরণ بال-سب دھرنےر اکلآیگن آمادےر مڈھے، سب دھرنےر کلآیگن ہئتے آمارا بھ دُورے۔ بیڈمیرا آمادےر ائی دُوربستھار اُپر آناند بوڈ کرے، پرکاشے آمادےر دُرنام گاویا ہئ اےب آمادےرکے لہئیا اُپہاس کرا ہئ۔

اُخانےہ شےس نئ برةً سہی آمادےر کلجیجر ٹکرا نیا سبذتار پرتی آنورست یوبکگن اِسلامےر پُت-پبتر بیڈانسمُھکے اُپہاس کرے۔ کٹای کٹای دوش خُجییا بےڈای اےب ائی پبتر شرییتکے آمالےر اُیوگن، آنرثک و بےکار منے کرے۔ اُباک ہئتے ہئ یے جاتی اکدا پیپاسا مِٹایاھے، آج تہارا کین پیپاسارت! یے جاتی دُنیاکے سبذتا و ساماجیکتار سبک پڈایاھے آج تہارا کین اساماجیک و اسبذ؟

جاتیر دِشاریگن آج ہئتے آنےک آگےہ آمادےر دُوربستھاکے آنوڈابن کریاھن اےب ناناذابے آمادےر سہشودنرے چسٹا کریاھن کِست (کبیر ڈایا)۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

“چیکِٹسا یتہئ کرا ہئل رोग ततहै बाढ़िया चलिल।”

بَرتمان اُبستھ یخن اذیکتار شوچنیی پریایے آسیا داڈایاھے اےب اُتیترے تولنا ی ڈبیا ی آر و بےہی بیپجنگ و اُککارم ی دےخا یایتےھے تخن آمادےر چُپ کریا بسیا ٹاکا اےب سکرِیڈابے چسٹا نا کرا اک امارجنیی اُپراڈ۔

کِست باسب کین پدکسپ نےویار پُورے آمادیگکے اُبشای اِ سکل کارنگسمُھ چِستا کریتے ہئبے، یے سکل کارنگے آمارا ائی اُپمان و لالچنار آجابه پتیت ہئیاچ۔ آمادےر ائی اُبنتی و اذہ: پتنےر بیڈن کارنگ بَرنا کرا ہئ اےب اُہا دُور کرار جنی بیڈن پدکسپ گُھن کرا ہئیاھے۔ کِست پرتیٹ پدکسپ آنوپوگی و بیفل پُمانیت ہئیاھے۔ فله آمادےر پٹپُڈرکگنکے و نیراشی و ہٹاشای نیمجِست دےخا یایتےھے۔

باسب سত্য ہئل ائی یے، آج پریست آمادےر رोग निर्णयहै

سٹیکرپے ہئ ناہئ۔ یے سمست کارنگ بَرنا کرا ہئ اُہا پُکُت رोग नहे वरं रोगेर उपसर्ग मात्र। सूतरां यतक्षण पर्यस्त प्रकृत रोगेर प्रति मनोयोग देওয়া ना हईबे अं रोगेर मूल उत्सेर संशोधन व चिकित्सा ना हईबे ततक्षण पर्यस्त उपसर्गेर संशोधन व चिकित्सा असंभव व अवसंभव। काजैहै यतक्षण पर्यस्त आमरा प्रकृत रोगेर सठिक निर्णय व उहार सठिक चिकित्सा पद्धति जानिया ना लहैब ततक्षण पर्यस्त संशोधनेर व्यापारे आमादےर मतमत व्यक्त क्रा मारातुक डूल हईबे।

آمادےر دابی ہئل، آمادےر شرییت امن اکٹ پُرناسٹ خوادایی بیڈان، یاهہ کیامت پریست آمادےر دینی و دُنیاوی کامیابی ر جِستادار۔ اتاےب کین کارنگ ناہئ یے، آمارا نیجےرای نیجےدےر رोग निर्णय करिब अं निजैरहै उहार चिकित्सा शुरू करिया दिब। वरं आमादےर जन्य जरूरी हईल ये, कुरआने हाकीम हईतے आमादےर मूल रोग निर्णय करि अं हक व हेदायातेर मारकाज अइ कुरआन हईतےहै सै रोगेर चिकित्सापद्धति जानिया उहाके कार्ये परिणत करि। आर कुरआने हाकीम येहेतु कियामत पर्यस्तेर जन्य परिपूर्ण जीवन बिडान, सेहेतु कौन कारण नाहै ये, अइ नाजुक परिस्थिति ते कुरआन आमादےर पठपुडरन करिते अपारग हईबे।

یَمین و آسمانےر اکماٹ مالیک مہان آلالہہ تالالار سات ویا دا رہیاھے یے، پُٹیبیر بادشاهی و خেলাفت مومین بانادےر جنی۔ پبتر کُراآنے اُرشاد ہئیاھے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (نور-۴)
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم
میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح
کئے کہ ان کو ضرور پُورے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

اُرث : تومادےر مڈھے یاهارا کِمان آنیاھے اےب نیک آمال کریاھے تہادےر سہت آلالہہ تالالا ویا دا کریاھن یے، اُبشای تہادیگکے یَمینےر خلیفا بانہئبےن۔ (نور، آيات-۴۴)

آر اِہا و سائننا دیاھن یے، مومینگن سربدا کافےردےر اُپر بیجی ٹاکیبے اےب کافےردےر کین بکُ و ساہایکاری ٹاکیبے نا۔ یمن پبتر کُراآنے اُرشاد ہئیاھے۔

وَلَقَدْ كُفِّرْنَا كُفْرًا وَلَوْلَا اَدْبَارُ ثَمَرِ
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (فتح-۲۴)
اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر
بھاگتے۔ پھر نہ پلے کوئی یار و مددگار۔

অর্থ : আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে অবশ্যই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত এবং তাহারা কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইত না। (ফাত্হ, আয়াত-২২)

আর মুমিনদের মদদ ও সাহায্য আল্লাহ তায়ালা জিস্মায় রহিয়াছে
এবং তাহারা ই সর্বদা উন্নত শির ও মর্যাদাশীল থাকিবে।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْكَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم- ۵۷) اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

অর্থঃ আর মুমিনদিগকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। (রুম, আয়াত-৪৭)

اور تم بہت مت ہار اور بخت کرا اور
غالب تم ہی رہو گے اگر تم لوہے مومن ہے۔

অর্থ : তোমরা হিম্মতহারা হইও না ; দুঃখিত হইও না, তোমরাই বিজয়ী থাকিবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও। (আলি-ইমরান, আয়াত-১৩৯)

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (ساقون ۶)

اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی ۔

অর্থ : আর ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাঁহার রাসূলের ও মুমিনদের। (মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, মুসলমানদের ইজ্জত, শান-শওকত, উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তাহাদের ঈমানী গুণাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত যদি তাহাদের সম্পর্ক আল্লাহ ও রাসূলের সহিত মজবুত থাকে (যাহা ঈমানের উদ্দেশ্য) তবে সবকিছুই তাহাদের। আর খোদা না করুন যদি এই সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা পয়দা হইয়া গিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ ধ্বংস, অপমান ও জিল্লতি রহিয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُشْرٌ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَلَوْ أَصَابَ الْمُنِيَّةَ
فَلَوْ أَصَابَ بِالصَّبْرِ ۖ (سورۃ عصر)

قسم ہے زمانہ کی انسان بڑے خُشارے میں ہے
مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
کئے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے
رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

অর্থ : যমানার কসম ! মানবজাতি বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে

রহিয়াছে ; কিন্তু যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অপরকে পাবন্দী করার উপদেশ দিতে থাকে। (সূরা আছর)

আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইজ্জত ও সম্মানের চরমে পৌঁছিয়াছিলেন আর আমরা অপমান ও জিল্লতীর শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি। অতএব বুঝা গেল যে, তাঁহারা পরিপূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত ছিলেন আর আমরা এই মহান নেয়ামত হইতে বঞ্চিত। যেমন সত্য সংবাদদাতা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খবর দিয়াছেন—

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبْغِي مِنَ
الْإِسْلَامِ إِلَّا رُسْنَهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ
إِلَّا رُسْنَهُ۔ (مشکوٰۃ)

یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے
کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا،
اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔

অর্থ : অতিসত্বর এমন সময় আসিবে যে, ইসলামের শুধু নাম বাকী থাকিবে আর কুরআনের শুধু লিখিত হরফ বাকী থাকিবে। (মিশকাত)

এখন গভীরভাবে চিন্তার বিষয় এই যে, সত্যিই যদি আমরা ঐ প্রকৃত ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি যাহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পছন্দনীয় এবং যাহার সহিত আমাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও কামিয়াবী সম্পর্কযুক্ত। তবে কি উপায় রহিয়াছে যাহা অবলম্বন করিলে আমরা সেই হারানো নেয়ামত ফিরিয়া পাইতে পারি আর ঐ সকল কারণই বা কি? যদ্বরূন ইসলামের রূহ আমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে আর আমরা প্রাণহীন দেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি।

যখন আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করা হয় এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের কারণ তালাশ করা হয়, তখন জানা যায় যে, এই উম্মতকে একটি অতি উচু ও মহান কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল যাহার কারণে তাহাদিগকে খাইরুল উমাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মতের সম্মানজনক খেতাব দেওয়া হইয়াছে।

দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ ওয়াহদাহ্ না-শারীকা লাহুর যাত ও ছিফাতের পরিচয় লাভ করা। আর ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতিকে সর্বপ্রকার খারাবী ও অপবিত্রতা হইতে পাক-সাফ করিয়া যাবতীয় কল্যাণ ও গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত না করা হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হাজারো রাসূল ও আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে এবং সর্বশেষে এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা দানের জন্য সাইয়্যিদুল আশ্বিয়া ওয়াল মরসালীন

(۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّ قَدْ حَصَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَهُ أَحَدًا فَلَصِقْتُ بِالْجُجْرَةِ اسْتَمِعَ مَا يَقُولُ فَقَعَدَ عَلَيَّ الْبُسْبُرَ فَحَبَدَ اللَّهُ وَانْحَى عَلَيْهِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ فَبَدَأَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا أُجِيبُ لَكُمْ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتَسْتَعِزُّونِي فَلَا أُنْصِرُكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِمْ حَتَّى

৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার নূরানী মহারার উপর এক বিশেষ আলামত দেখিয়া অনুভব করিলাম যে, কোন অকৃত্রিমপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহারও সহিত কথা বলিলেন না এবং ওজু করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। আমি মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। যেন ষাহা কিছু এরশাদ করেন শুনিতে পাই। হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে উপবেশন করিলেন এবং হামদ ও ছানার পর কবমািলেন : ‘হে লোকসকল ! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন : তোমরা

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَظَّمْتَ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعْتُ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا تَرَكْتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمْتَ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ.

(کذا فی الدرر عن الحکیم الترمذی)

کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

উল্লেখিত হাদীসসমূহের উপর চিন্তা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার লানত ও গজবের কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী যখন এই কাজ ছাড়িয়া দিবে তখন তাহাদিগকে কঠিন মুসীবত, দুঃখ-যাতনা, অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে লিপ্ত করা হইবে এবং সর্বপ্রকার গায়েবী মদদ ও সাহায্য হইতে মাহরুম হইয়া যাইবে। আর এই সবকিছু এইজন্য হইবে যে, তাহারা

নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে চিনিতে পারে নাই এবং যে কাজ পুরা করা তাহাদের জিহ্মাদারী ছিল সেই ব্যাপারে তাহারা গাফেল রহিয়াছে। এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়াকে দুর্বল ও নিস্তেজ ঈমানের আলামত বলিয়াছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে—

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُتَكْرِفًا لِعِزَّةِ بَيْدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَعِزُّ بِإِسْلَامِهِ
فَإِنَّهُ لَا يَسْتَعِزُّ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (مسلم)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে তবে সে যেন নিজের হাত দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহার শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহারও শক্তি না রাখে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে, আর উহার এই শেষ অবস্থাটি ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর।

সূতরাং শেষ অবস্থাটি যেমন ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর হইল তেমনি প্রথম অবস্থাটি পূর্ণ দাওয়াত ও পূর্ণ ঈমানের স্তর হইল।

ইহা হইতে আরো স্পষ্ট হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

مَا مِنْ شَيْءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَائِثُ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ
وَيَقْدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ انْهَارًا تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ
مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَيْدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّ
رَأَى ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (مسلم)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নীতি এই যে, প্রত্যেক নবী আপন সঙ্গী ও যোগ্য অনুসারীদের এক জামাত রাখিয়া যান। এই জামাত নবীর সুন্নতকে কায়েম রাখে, এবং যথাযথভাবে উহার অনুসরণ করে, অর্থাৎ শরীয়তে ইলাহীকে নবী যে অবস্থায় এবং যেভাবে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে অবিকল হেফাজত করে এবং উহাতে সামান্যতমও পরিবর্তন আসিতে দেয় না। কিন্তু উহার পর খারাবী ও ফেতনা-ফাসাদের যমানা আসে এবং এমন লোক পয়দা হয় যাহারা নবীর তরীকা ও আদর্শ হইতে সরিয়া যায়।

তাহাদের কার্যকলাপ তাহাদের দাবীর বিপরীত হয়, তাহারা এমন সব কাজ করিয়া থাকে যাহা শরীয়তে হুকুম করা হয় নাই, সুতরাং এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হক ও সুন্নতকে কায়েম করার লক্ষ্যে নিজের হাতের দ্বারা কাজ নিল সে মুমিন, আর যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারিল না কিন্তু জবানের দ্বারা কাজ নিল সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি ইহাও করিতে পারিল না কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস ও নিয়তের মজবুতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিল সেও মুমিন; কিন্তু এই শেষ স্তরের পর ঈমানের আর কোন স্তর নাই—এখানেই ঈমানের সীমানা শেষ হইয়া যায়। এমনকি ইহার পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকিতে পারে না।

এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ইমাম গাযালী (রহঃ) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন : ‘ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ দ্বীনের এমন একটি শক্তিশালী স্তম্ভ, যাহার সহিত দ্বীনের সমস্ত কাজ সম্পর্কযুক্ত। এই কাজকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। খোদা না করুন যদি এই কাজকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ইহার এলেম ও আমলকে পরিত্যাগ করা হয় তবে নাউযবিলাহ নবুওত বেকার সাব্যস্ত হইবে, সততা যাহা মানব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া যাইবে, অলসতা ব্যাপক হইয়া যাইবে, গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রশস্ত রাস্তাসমূহ খুলিয়া যাইবে, সারা দুনিয়া অজ্ঞতায় ডুবিয়া যাইবে, সমস্ত কাজ-কর্মে খারাবী আসিয়া যাইবে, পারম্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ শুরু হইয়া যাইবে, সমাজ খারাপ হইয়া যাইবে, মখলুক ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যাইবে। এই ধ্বংস ও বরবাদী তখন বুঝে আসিবে যখন হাশরের দিন খোদায়ে পাকের সামনে হাজির হইতে হইবে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

আফসোস, শত আফসোস যে আশংকা ছিল, উহাই সামনে আসিয়া গেল, আর মনে যে খটকা ছিল উহাই চোখে দেখিতে হইল—আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সেই সতেজ স্তম্ভের (দাওয়াতের) এলেম ও আমলের নিদর্শনসমূহ মিটিয়া গিয়াছে, উহার হাকীকত ও জাহেরী আমলের বরকতসমূহ খতম হইয়া গিয়াছে। অন্তরে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে, আল্লাহর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নফসের খাহেশাতের অনুসরণে মানুষ জীবজন্তুর মত নির্ভীক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ জমিনের বুকে এইরূপ সত্যবাদী মুমিন পাওয়া শুধু কঠিন ও

الْأَكْثَرُ رَاجِعٌ وَكُلُّكُمْ مُسْتَوٍ
عَنْ رِجَالِهِ فَإِلَّا مِثْرُ الذِّمَى عَلَى
التَّائِبِ رَاجِعٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مُسْتَوٍ
عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاجِعٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مُسْتَوٍ عَنْهُمْ وَالْمَرْءُ رَاجِعٌ
عَلَى نِسْتِ بَعْلِهَا وَكَذَلِكَ هِيَ
مُسْتَوَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاجِعٌ عَلَى

୩୩୫

আমাদের ঈমানের উপর মজবুত থাকি তবে অন্যের গোমরাহী আমাদের জন্য কোন ক্ষতিকারক হইবে না। যেমন কুরআন শরীফে আসিয়াছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ
أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (বান্দে-১৮৬)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم
راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے
اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔
(بیان القرآن)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! নিজেদের চিন্তা কর, যখন তোমরা সঠিক পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট তাহার কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। (মায়দা : আয়াত-১০৪)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অর্থ ইহা নহে যাহা বাহ্যতঃ বুঝা যাইতেছে। কেননা এইরূপ অর্থ আল্লাহ পাকের হেকমত ও শরীয়তের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। ইসলামী শরীয়ত সম্মিলিত জিন্দেগী। সম্মিলিত এসলাহ ও সম্মিলিত উন্নতিকে মূল বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়াছে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মতকে এক দেহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে যে, এক অঙ্গ ব্যথিত হইলে উহার কারণে সমস্ত দেহ অস্থির হইয়া যায়।

আসল কথা হইল, মানবজাতি যতই উন্নতি করুক এবং উন্নতির চরমে পৌঁছিয়া যাক তাহাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই থাকিবে যাহারা পথ ছাড়িয়া গোমরাহীতে লিপ্ত হইবে। অতএব, উক্ত আয়াতে মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা রহিয়াছে যে, যখন তোমরা হেদায়াত ও সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তখন ঐ সকল লোকদের কারণে তোমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই যাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।

অধিকন্তু প্রকৃত হেদায়াত তো ইহাই যে, মানুষ শরীয়তে মুহাম্মদীকে উহার সমস্ত হুকুম-আহকাম সহকারে কবুল করিবে। আর আল্লাহ তায়ালা হুকুমসমূহের মধ্য হইতে সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধও একটি হুকুম।

আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর এই এরশাদের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি বলেন—

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ
فَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَرَوْهَا لَمْ تَرَوْهَا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت پڑھ رہے ہو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
فَإِنِّي سَبَّحْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِشْرَافَاتٍ هُوَ تَسْبِيحٌ كَبِيرٌ لَوْ لَوْ
خِلَافَ شَرَعٍ كَيْسِي حَيْزٍ كَوَيْسِي
تَغْيِيرٌ كَرِيحٍ تَوْقِيرٌ كَرِيحٍ تَوْقِيرٌ
لَوْ لَوْ كَوَيْسِي تَغْيِيرٌ كَرِيحٍ تَوْقِيرٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
فَإِنِّي سَبَّحْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِشْرَافَاتٍ هُوَ تَسْبِيحٌ كَبِيرٌ لَوْ لَوْ
خِلَافَ شَرَعٍ كَيْسِي حَيْزٍ كَوَيْسِي
تَغْيِيرٌ كَرِيحٍ تَوْقِيرٌ كَرِيحٍ تَوْقِيرٌ
لَوْ لَوْ كَوَيْسِي تَغْيِيرٌ كَرِيحٍ تَوْقِيرٌ

অর্থ : হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পেশ করিতেছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাইতে শুনিয়াছি, যখন মানুষ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ হইতে দেখে এবং উহা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে তখন অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে স্বীয় আজাবে লিপ্ত করিবেন।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণও উক্ত আয়াতের অর্থ ইহাই করিয়াছেন। ইমাম নবভী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলিতেছেন যে, এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে মোহাক্কে ওলামায়ে কেরামগণের সহীহ অভিমত এই যে, যখন তোমরা ঐ কাজকে পুরা করিবে যাহার প্রতি তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এখন অন্যের অপরাধ তোমাদের কোন ক্ষতি করিবে না—যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

لَا تَزِدُكَ زَرْعًا وَتَذَرُ الْآخِرَى

(অর্থাৎ—কেহ অপরের বোঝা বহন করিবে না।) অতএব আমার বিল মারুফ ও নাই আনিল মুনকার যেহেতু আল্লাহর আদেশ করা হুকুমসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই যে ব্যক্তি উক্ত হুকুম পুরা করিল কিন্তু নসীহত শ্রবণকারী ইহার উপর আমল করিল না—এমতাবস্থায় উপদেশদাতার উপর আল্লাহর কোন অসন্তুষ্টি নাই। কারণ সে তাহার ওয়াজিব কর্তব্য অর্থাৎ আমার-বিল মারুফ ও নাই আনিল-মুনকার আদায় করিয়াছে; অন্যের কবুল তাহার জিস্মায় নহে।

তৃতীয় কারণ এই যে, সাধারণ ও খাছ লোক, আলেম ও জাহেল প্রত্যেকেই এসলাহ ও সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, এখন মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব ও কঠিন ব্যাপার। যখন কাহারও সম্মুখে উম্মতের কোন

عَلَى الْقَوْلِ مِنْ دَرَجَةٍ وَأَعَدَّ
اللَّهُ الْحَسَنَاءَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِلِينَ
عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَتِ
مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا (نساء: ۱۲)

بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال
جان سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت
گھر بیٹھنے والوں کے۔ اور سب سے
اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا
ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو متقابل
گھر میں بیٹھنے والوں کے اجر عظیم دیا ہے یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے
ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت، رحمت والے ہیں۔

অর্থ : যে সকল মুসলমান কোনরকম অসুবিধা ছাড়া ঘরে বসিয়া
রহিয়াছে, আর যাহারা নিজেদের জানমাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ
করিতেছে—এই উভয় দল কখনো সমান হইতে পারে না। যাহারা ঘরে
বসিয়া থাকে তাহাদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোককে অনেক
মর্যাদাশীল করিয়াছেন, যাহারা জান-মাল দিয়া জিহাদ করে এবং
সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা অতি উত্তম বাসস্থানের ওয়াদা
করিয়াছেন। জিহাদকারীদেরকে ঘরে অবস্থানকারীদের তুলনায় অনেক বড়
পুরস্কার দান করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহারা অনেক
উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত হাসিল করিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা
বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (নিসা, আয়াত-১৫, ১৬)

যদিও উপরোক্ত আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখিয়া
দাঁড়ানোকে বুঝানো হইয়াছে, যদ্বারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং
কুফর ও শিরক পরাজিত হয় ; কিন্তু যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা
সেই মহান সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তথাপি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া
আমাদের পক্ষে যতটুকু চেষ্টা ও মেহনত সম্ভব উহাতে কখনই কমি করা
চাই না। আমাদের এই মামুলী চেষ্টা ও মেহনত আমাদের দ্বারা ধীরে ধীরে
আগে বাড়িয়া দিবে।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ : যাহারা আমার দ্বিনের জন্য চেষ্টা ও মেহনত করে আমি
তাহাদের জন্য আমার পথসমূহ খুলিয়া দেই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে,
আল্লাহ তায়ালা দ্বিনে মোহাম্মদীকে টিকাইয়া রাখার ও হেফাজতের ওয়াদা
করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিনের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য আমাদের আমল ও
চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম দ্বিনের খাতিরে যে পরিমাণ

সংশোধনমূলক কর্মসূচী পেশ করা হয় তখন ইহাই জবাব পাওয়া যায় যে,
মুসলমানদের তরফী এখন কি করিয়া সম্ভব, যখন তাহাদের নিকট না
আছে রাজত্ব ও বাদশাহী, না আছে মাল-দৌলত, না আছে যুদ্ধের
সরঞ্জাম, না আছে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি, না আছে বাহুবল, না আছে
পরস্পর ঐক্য ও একতা।

বিশেষ করিয়া দ্বিনদার শ্রেণী তো নিজেদের ধারণা মোতাবেক ইহা
ফয়সালা করিয়া লইয়াছে যে, এখন চতুর্দশ শতাব্দী ; নবুওয়তের জমানা
হইতে বহু দূরে, এখন মুসলমানদের অবনতি একটি অনিবার্য বিষয়।
অতএব উহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক ও বেকার।

এই কথা সত্য যে, নবুওয়তের যুগ হইতে যত বেশী দূরত্ব হইবে প্রকৃত
ইসলামের আলো ততই ম্লান হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার অর্থ কখনো এই
নহে যে, শরীয়তকে টিকাইয়া রাখা ও দ্বিনে মোহাম্মদীর হেফাজতের জন্য
কোনরূপ চেষ্টা ও মেহনত করিতে হইবে না। কেননা যদি ইহাই হইত এবং
আমাদের পূর্বপুরুষগণও খোদা না করুন যদি ইহাই বুঝিয়া লইতেন, তবে
আজ আমাদের পর্যন্ত দ্বিন পৌছিবার কোন পথ ছিল না। অবশ্য পরিস্থিতি
যখন বিপরীতমুখী তখন সময়ের গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া বেশী হিম্মত ও
মজবুতীর সহিত এই কাজকে লইয়া খাড়া হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, যে দ্বিনের ভিত্তি একমাত্র আমল ও মেহনতের
উপর ছিল আজ উহার অনুসারীগণ আমল হইতে একেবারে খালি। অথচ
কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন জায়গায় আমল ও মেহনতের
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, একজন এবাদতকারী যে
সারারাত্রি নফলে মগ্ন থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং আল্লাহ আল্লাহ
যিকিরে মশগুল থাকে সে কখনো ঐ ব্যক্তির সমান হইতে পারে না, যে
অন্যের সংশোধন ও হেদায়াতের ফিকিরে অস্থির থাকে।

কুরআনে করীম বিভিন্ন জায়গায় ‘জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ’ অর্থাৎ
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তাকীদ করিয়াছে এবং মোজাহেদের ফযীলত ও
শ্রেষ্ঠত্বকে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

ব্রাবর نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی غدر کے
گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ
کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد
کریں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ

অনিহা ও অবহেলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা ঐগুলি টিকাইয়া রাখাও মুশকিল নজরে আসিতেছে।

ষষ্ঠ কারণ এই যে, আমরা যখন দ্বীনের দাওয়াত লইয়া অন্যদের নিকট যাই, তখন তাহারা দুর্ব্যবহার করে, কঠোর ভাষায় জবাব দেয় এবং আমাদের সহিত অপমানকর আচরণ করে।

কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই কাজ আশ্বিয়ায় কেরামের প্রতিনিধিত্ব এবং এইরূপ কষ্ট ও মুসীবতে পতিত হওয়া এই কাজের বৈশিষ্ট্য আর আশ্বিয়ায় কেরাম এই রাস্তায় অনেক গুণ বেশী দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي رَشٍيعِ
الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ (حج- ১৮)

ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے لگے
لوگوں کے گزرو ہوں میں اور ان کے پاس
کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی تہنیتی
اڑاتے رہے۔

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে আগেকার লোকদের মধ্যে পয়গাম্বর প্রেরণ করিয়াছি এবং এমন কোন রসূল তাহাদের নিকট আসে নাই যাহার সহিত তাহারা বিদ্রূপ করে নাই। (হিজর, আয়াত-১০, ১১)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ‘হকের দাওয়াতের রাস্তায় আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে অন্য কোন নবীকে এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই।’

সুতরাং উভয় জাহানের সরদার এবং আমাদের মনিব যখন এই সমস্ত মুসীবত ও কষ্ট ধৈর্যসহকারে বরদাশত করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুসারী, তাঁহারই কাজ লইয়া দাঁড়াইয়াছি, আমাদেরও এই সকল মুসীবতের কারণে পেরেশান হওয়া চাই না এবং ধৈর্যসহকারে বরদাশত করা উচিত।

উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনা হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের আসল রোগ হইল, আমাদের দ্বীনের রূহ ও হাকিকী ঈমান দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আমাদের দ্বীনী জযবা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের ঈমানী শক্তি খতম হইয়া গিয়াছে। আসল ঈমানের মধ্যেই যখন অবনতি আসিয়া গিয়াছে তখন উহার সহিত যত গুণাবলী ও কল্যাণ সম্পর্কযুক্ত ছিল সেইগুলির অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং জরুরী ছিল। এই

দুর্বলতা ও অবনতির কারণ হইল ঐ আসল বস্তুকে ছাড়িয়া দেওয়া, যাহার উপর সম্পূর্ণ দ্বীনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আর উহা হইল সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধ। আর এ কথা সত্য যে, কোন জাতি ঐ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে না যে পর্যন্ত জাতির ব্যক্তিবর্গ সংগুণে গুণান্বিত না হয়।

সুতরাং আমাদের রোগের চিকিৎসা ইহাই যে, আমরা তবলীগের দায়িত্ব লইয়া এমনভাবে দাঁড়াই যাহাতে আমাদের ঈমানী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইসলামী জযবা জাগিয়া উঠে, আমরা খোদা ও রাসূলকে চিনিতে পারি এবং খোদায়ী হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিতে পারি। আর ইহার জন্য আমাদেরকে ঐ পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে যে পন্থা সাইয়্যিদুল আশ্বিয়া হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মুশরিকদের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (احزاب)

بے شک تمہارے لئے رسول اللہ میں
اچھی پیروی ہے۔

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে। (আহযাব, আয়াত-২১)

এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়া ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন :

كَانَ يُصْلِحُ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا

অর্থ : এই উম্মতে—মুহাম্মদিয়ার শেষের দিকে যে সমস্ত লোক আসিবে তাহাদের সংশোধন ঐ পর্যন্ত হইতে পারে না যে পর্যন্ত তাহারা প্রথম যুগের সংশোধনের পন্থা গ্রহণ না করিবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হকের দাওয়াত লইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি একা ছিলেন, তাঁহার কোন সাথী ও সমর্থনকারী ছিল না। দুনিয়াবী কোন শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহার কওমের লোকদের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহংকার চরমে পৌছিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হক কথা শুনা এবং মানার জন্য কেহই তৈয়ার ছিল না। বিশেষতঃ যে কালেমায়ে হকের তবলীগ করার জন্য তিনি খাড়া হইয়াছিলেন সমস্ত কওমের অন্তর উহার প্রতি বিরূপ ও বিতৃষ্ণা ছিল। এহেন অবস্থায় এমন কোন শক্তি ছিল যাহার বদৌলতে একজন সহায় সম্বলহীন নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন মানুষ কওমের সকলকে নিজের দিকে টানিয়া নিলেন। এখন চিন্তা করুন—উহা কি জিনিস ছিল যাহার প্রতি

هِيَ اَحْسَنُ لِرَبِّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ
صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
(نحل - ۱۶ع)

کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو پیشک
تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص
کو جو گمراہ ہو اس کی راہ سے وہی خوب جانتا
ہے راہ چلنے والوں کو۔

اُर्थ : ہے نبی ! آپانی لোকدیگکے آپانار प्रतिपालकरे पथे
आहवान करून हेकमत و उत्तम उपदेशेर सहित एवं ताहादर सहित
उत्तम पन्थाय वितर्क करून। निश्चयई आपनार रब् ई व्यक्तिके ভালभावे
जानेन, ये ताहार रास्ता हईते अष्ट हईया गियाछे। तिनिई ভালभावे
जानेन याहारा सठिक पथे रहियाछे। (नाहल, आयात-۱۲۵)

आर इहाई छिल ई राजपथ याहा ताँहार जन्य एवं ताँहार
अनुसारीदर जन्य निर्धारण करा हईयाछिल—

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ
عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِيْ
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ
الشُّرَكِيّٰ ۝ (يوسف - ۱۳ع)

کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلا تاہوں اللہ
کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور جتنے میرے
تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک ہے، اور
میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اُर्थ : বলিয়া দিন, ইহাই আমার পথ, আহবান করি আল্লাহর দিকে
জানিয়া বুঝিয়া, আমি এবং আমার যত অনুসারী রহিয়াছে তাহারাও।
আর আল্লাহ পবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(ইউসুফ, আয়াত-۱۰৮)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى
اللّٰهِ وَعِبَدَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنِّیْ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (احم سجدہ - ۴ع)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا
کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں
فرماں برداروں میں سے ہوں۔

اُर्थ : সেই ব্যক্তির কথা ہईتے उत्तम কথা আর কাহার ہईتے পারে,
যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি
মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হ-মীম সিজদা, আয়াত-۳۳)

সুতরাং আল্লাহ পাকের দিকে তাঁহার মখলুককে ডাকা, পথহারাদিগকে
সঠিক পথ দেখানো এবং গোমরাহদিগকে হেদায়াতের রাস্তা দেখানো
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উদ্দেশ্য ও

তিনি মখলুককে আহবান করিলেন। আর যে ব্যক্তি ঐ জিনিসকে পাইয়া
গেল সে চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া রহিল। সমগ্র দুনিয়াবাসী
জানে যে, উহা শুধুমাত্র একটি ছবক ছিল, যাহা তাঁহার মূল লক্ষ্যবস্তু ও
উদ্দেশ্য ছিল যাহা তিনি মানুষের সামনে পেশ করিলেন—

اَلَا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهٖ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۝ (ال عمران - ۴ع)

بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ
کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک
نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی دوسرے
کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

اُर्थ : আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত না করি,
তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি এবং আমাদের মধ্য হইতে কেহ
যেন আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রব সাব্যস্ত না করে।

(আলি ইমরান, আয়াত-৬৪)

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর এবাদত এবং আনুগত্য
ও ফরমাবরদারী করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এক আল্লাহ ব্যতীত
সবকিছুর বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একটি কর্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া
দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা হইতে সরিয়া অন্যমুখী
হইবে না—

اَسْتَعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ ۝ (اعراف - ১ع)

তুম লোক اس کا اتباع کرو جو تمہارا رب
تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے
اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا
اتباع مت کرو۔

اُर्थ : তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ হইতে যাহা কিছু
আসিয়াছে, তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য
কাহারও অনুসরণ করিও না। (আ'রাফ, আয়াত-৩)

ইহাই ছিল ঐ আসল তালীম যাহার প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁহাকে
ছকুম দেওয়া হইয়াছে—

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ
اَنْزَلَ اللّٰهُ ۝ (نحل - ১২৫ع)

এ মুহাম্মদ! তুম লোক লোকের
কি طرف হকمت اور নিক نصیحت سے اور ان

প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ ও উহার মূলে পানি সিঞ্চনের জন্য হাজার হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ۝ (الانبیاء ع ۲)

اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول
مگر اس کی جانب سے وحی بھیجتے تھے کہ کوئی
معبود نہیں بجز میرے پس میری سجدگی کرو۔

অর্থ : আপনার পূর্বে আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহার প্রতি এই ওহী নাযিল করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। (আম্বিয়া, আয়াত-২৫)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও অন্যান্য সকল আশ্বিয়ায়ে কেরামের জীবনের প্রতিটি পুণ্যময় মুহূর্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর উহা হইল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াহদাহ লা শারীকালাহর যাত ও ছিফাতের উপর একীন করা। ইহাই হইল ঈমান ও ইসলামের মূলকথা। আর এইজন্যই মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : আমি জ্বিন ও ইনছানকে শুধুমাত্র এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা বান্দা হইয়া জীবন যাপন করে। (যারিয়াত, আয়াত-৫৬)

এখন যেহেতু জীবনের মাকসাদ স্পষ্ট হইয়া গেল এবং আসল রোগ ও উহার চিকিৎসার তরীকা জানা হইয়া গেল, কাজেই রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করিতে এখন আর কোন অসুবিধা হইবে না এবং এই লক্ষ্যে চিকিৎসার যে কোন তরীকাই গ্রহণ করা হইবে—ইনশাআল্লাহ উপকারী ও ফলদায়ক হইবে।

আমরা আমাদের দুর্বল জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী মুসলমানদের কামিয়াবী ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি কর্ম পদ্ধতি ঠিক করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে যাহাকে ইসলামী জিন্দেগী অথবা আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের জিন্দেগীর নমুনা বলা যাইতে পারে। যাহার সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের খেদমতে পেশ করা হইল :-

সর্বপ্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, প্রতিটি মুসলমান সর্বপ্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর কালেমা

বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার প্রসার ও খোদায়ী হুকুম-আহকামের প্রচলন ও উহাকে শক্তিশালী করাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানাইয়া লইবে এবং এই কথার দৃঢ় ওয়াদা করিবে যে, আমি আল্লাহ তায়ালায় প্রতিটি হুকুম মান্য করিব এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবার চেষ্টা করিব। কখনই আল্লাহ তায়ালায় নাফরমানী করিব না। অতঃপর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলির উপর আমল করিবে :

(১) কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঠিক উচ্চারণের সহিত মুখস্থ করা। উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বুঝা ও অন্তরে গাঁথিয়া নেওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজের পুরা জীবনকে তদনুযায়ী গড়িয়া তোলার ফিকির করা।

(২) নামাযের পাবন্দী করা এবং নামাযের আদব ও শর্তসমূহের প্রতি খেয়াল রাখিয়া খুশু-খুযুর সহিত নামায আদায় করা। নামাযের প্রতিটি রোকন আদায়ের সময় আল্লাহ তায়ালায় বড়ত্ব ও মহত্ব এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতার ধ্যান করা। মোটকথা, সর্বদা এই চেষ্টায় লাগিয়া থাকা যেন নামায এমনভাবে আদায় হয়—যাহা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে পেশ হওয়ার উপযুক্ত হয়। এইরূপ নামাযের চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর দরবারে তওফীক চাহিবে। যদি নামাযের নিয়ম জানা না থাকে তবে উহা শিখিবে এবং নামাযে যাহা কিছু পড়া হয় তাহা মুখস্থ করিবে।

(৩) কুরআনে করীমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আন্তরিক মহব্বত পয়দা করিতে হইবে, যাহার দুইটি তরীকা রহিয়াছে :

(ক) রোজানা কিছু সময় আদব ও এহতেরামের সহিত অর্থের প্রতি ধ্যান করিয়া তেলাওয়াত করা। আলেম না হইলে এবং অর্থ বুঝিতে না পারিলে অর্থ বুঝা ছাড়াই তেলাওয়াত করিবে এবং মনে করিবে যে, আমার কামিয়াবী ও উন্নতি ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। শুধু শব্দ তেলাওয়াতও বড় সৌভাগ্য ও খায়ের-বরকতের কারণ। আর শব্দও যদি তেলাওয়াত করিতে না পারে তবে রোজানা কিছু সময় কুরআন শিক্ষার কাজে ব্যয় করা।

(খ) নিজের আওলাদ এবং মহল্লা ও এলাকার ছেলেমেয়েদের কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ফিকির করা এবং সকল ক্ষেত্রে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া।

(৪) কিছু সময় আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরে-ফিকিরে অতিবাহিত করা। ওজীফা হিসাবে কিছু পাঠ করার জন্য সুন্নতের অনুসারী তরীকতের কোন

শায়খের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। তা না হইলে ছুওম কালেমা অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহি ওয়ালা-হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল-আজীম, দরুদ শরীফ ও এস্তুগফার পড়িবে। অর্থের প্রতি খেয়াল রাখিয়া ও দিল লাগাইয়া প্রত্যেকটি রোজানা সকাল-সন্ধ্যা এক তসবীহ (১০০ বার) করিয়া পাঠ করিবে। হাদীস শরীফে এই তসবীহ পাঠের বিরাম ফযীলত আসিয়াছে।

(৫) প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের ভাই মনে করা। তাহার সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির আচরণ করা। মুসলমান হওয়ার কারণে তাহার আদব ও সম্মান করা। কোন মুসলমান ভাইয়ের কষ্টের কারণ হইতে পারে এমন কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পাবন্দি সহকারে নিজে পালন করিবে এবং প্রত্যেক মুসলমান ভাইও যেন উহা পালন করিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা করিবে। আর ইহার পস্থা হইল এই যে, দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজেও কিছু সময় ফারেগ করিবে অন্যদেরকেও তরগীব দিয়া দ্বীনের খেদমত ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তৈয়ার করিবে।

যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস-সালাম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, বিভিন্ন রকম মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছেন, সাহায্যে কেরাম ও আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুগগণ এই কাজে নিজেদের জীবন ব্যয় করিয়াছেন এবং উহার জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান কুরবান করিয়াছেন, সেই দ্বীনের প্রচার ও হেফাজতের জন্য কিছু সময় বাহির না করা বড় দুভাগ্য ও ক্ষতির কারণ। আর ইহাই সেই মহান দায়িত্ব যাহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে আজ আমরা ধ্বংস ও বরবাদ হইতেছি।

আগেকার দিনে মুসলমান হওয়ার অর্থ ইহা বুঝা হইত যে, নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু দ্বীনের প্রচার ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য কুরবান করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি এই কাজে গাফলতি করিত তাহাকে বড় নাদান মনে করা হইত। কিন্তু আফসোস যে, আজ আমরা মুসলমান হিসাবে পরিচিত এবং চোখের সামনে দ্বীনের কাজ মিটিতেছে দেখিতেছি, তবুও সেই দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও হেফাজতের জন্য চেষ্টা করা হইতে দূরে সরিয়া থাকি। মোটকথা, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা যাহা মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও আসল কাজ ছিল এবং যাহার সহিত আমাদের উভয় জাহানের কামিয়াবী

ও উন্নতি জড়িত ছিল এবং যাহা ছাড়িয়া দিয়া আজ আমরা লাক্ষিত ও বেইজ্জত হইতেছি ; এখন পুনরায় আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ কাজকে আমাদের জীবনের অঙ্গ ও আসল কাজ বানানো উচিত। যাহাতে আল্লাহর রহমত পুনরায় জোশে আসিয়া যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও সুখ নসীব হয়। ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম বাদ দিয়া শুধু এই কাজেই লাগিয়া যাইবে। বরং উদ্দেশ্য হইল, দুনিয়ার অন্যান্য জরুরত যেমন মানুষের সাথে লাগিয়াই থাকে এবং সেইগুলিকে পুরা করা হয়, তেমনি এই কাজকেও জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া ইহার জন্য সময় বাহির করা হয়। কিছু লোক যখন এই কাজের জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা নিজ মহল্লায়, মাসে তিন দিন আশ-পাশ এলাকায়, বছরে এক চিল্লা দূরবর্তী এলাকায় এই কাজ করিবে এবং চেষ্টা করিবে—ধনী হউক বা গরীব, ব্যবসায়ী হউক বা চাকুরীজীবী, জমিদার হউক বা কৃষক, আলেম হউক বা গায়ের আলেম প্রত্যেক মুসলমান যেন এই কাজে শরীক হইয়া যায় এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি পালন করিয়া চলে।

কাজ করার তরীকা : কমপক্ষে দশজনের জামাত তাবলীগের জন্য বাহির হইবে। সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বানাইবে। অতঃপর সকলেই মসজিদে জমা হইবে এবং ওজু করিয়া দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিবে (যদি মকরুহ ওয়াজু না হয়)। নামাযের পর সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালা দরবারে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিবে। আল্লাহ তায়ালা মদদ, নুসরত এবং কামিয়াবী ও তওফীক চাহিবে। নিজেদের মজবুতি ও দৃঢ়তার জন্য দোয়া করিবে। দোয়ার পর ধীরস্থির ও শান্তভাবে যিকির করিতে করিতে রওনা হইবে এবং কোনরূপ বেহুদা কথা বলিবে না। যেখানে তাবলীগ করিতে হইবে সেইখানে পৌছিয়া সকলে মিলিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে এবং পুরা মহল্লায় বা গ্রামে গাশত করিয়া লোকদেরকে জমা করিবে। সর্বপ্রথম তাহাদিগকে নামায পড়াইবে অতঃপর উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি পাবন্দি সহকারে পালন করার ওয়াদা লইবে এবং এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার জন্য তৈয়ার করিবে। আর এই সকল লোকের সহিত তাহাদের বাড়ীর দরওয়াজায় পৌছিয়া স্ত্রীলোকদেরকেও নামায পড়াইবার ব্যবস্থা করিবে এবং এই বিষয়গুলি পালন করার জন্য তাকীদ করিবে।

যেই সকল লোক এই কাজ করার জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তাহাদের একটি জামাত বানাইয়া দিবে এবং তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে

আমীর বানাইয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের দ্বারা কাজ শুরু করাইয়া দিবে এবং তাহাদের কাজের দেখাশুনা করিবে। তবলীগ করনেওয়াল প্রত্যেক ব্যক্তি আমীরকে মানিয়া চলিবে আর আমীরের উচিত সাথীদের খেদমত করা, আরাম পৌছানো, হিম্মত বাড়ানো এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কোন ক্রটি না করা এবং যে সব কাজে পরামর্শ দরকার সেই সব কাজে সকলের নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া সেই অনুযায়ী আমল করা।

তবলীগের আদব

এই কাজ আল্লাহ তায়ালা এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় এবং সকল নবীদের প্রতিনিধিত্ব। বস্তুতঃ কাজ যত বড় হয় সেই অনুপাতে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য অন্যকে হেদায়াত করা নহে বরং নিজের সংশোধন ও দাসত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করা ও তাঁহার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি হাসিল করা। অতএব, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়া উহার উপর আমল করা চাইঃ

(১) নিজের সমস্ত খরচ যথা খানা-পিনা, ভাড়া ইত্যাদি যথাসম্ভব নিজে বহন করিবে। আর সম্ভব হইলে গরীব সাথীদের উপরও খরচ করিবে।

(২) নিজের সাথীদের এবং এই পবিত্র কাজ যাহারা করিতেছে তাহাদের খেদমত ও সহযোগিতাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করিবে এবং তাহাদের আদব ও সম্মান করিতে ক্রটি করিবে না।

(৩) সাধারণ মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত আচরণ করিবে। নম্রতা ও খোশামোদের সহিত কথাবার্তা বলিবে। কোন মুসলমানকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে না। বিশেষ করিয়া ওলামায়ে কেরামকে ইজ্জত ও সম্মান করিতে কমি করিবে না। আমাদের উপর কুরআন ও হাদীসের ইজ্জত-আজমত ও আদব-এহতেরাম যেমন জরুরী, তেমনি সেই সকল পবিত্র ব্যক্তিদের ইজ্জত-আজমত ও আদব-এহতেরামও আমাদের উপর জরুরী, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আপন সর্বোচ্চ নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। হক্কানী ওলামায়ে কেরামকে অসম্মান ও হয় করা প্রকৃতপক্ষে দীনকে হয় করার সমতুল্য। যাহা আল্লাহ তায়ালা নারাজী ও গজবের কারণ হয়।

(৪) অবসর সময়গুলিকে মিথ্যা, গীবত, ঝগড়া-ফাসাদ, খেল-তামাশা

ইত্যাদি মন্দ কাজে ব্যয় না করিয়া দ্বীনি কিতাবাদি পাঠে এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে বসিয়া কাটাইবে; ইহাতে আল্লাহ ও রাসুলের কথা জানা হইবে। বিশেষ করিয়া তবলীগের দিনগুলিতে বেহুদা কথা ও কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। অবসর সময়গুলিকে আল্লাহর স্মরণ, যিকির-ফিকির, দরুদ-এস্তেগফার এবং নিজে শিক্ষা ও অন্যকে শিক্ষানোর কাজে ব্যয় করিবে।

(৫) জায়েয তরীকায় হালাল রুজি কামাই করিবে এবং মিতব্যয়িতার সহিত তাহা খরচ করিবে। পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শরীয়তসম্মত হক আদায় করিবে।

(৬) মতবিরোধপূর্ণ কোন মাসআলা এবং খুটিনাটি কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠাইবে না বরং আসল তওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে এবং দ্বীনের আরকান তথা ফরজ বিষয়সমূহের তবলীগ করিবে।

(৭) নিজের সমস্ত কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম এখলাসের সহিত করিবে। কেননা খাঁটি নিয়ত ও এখলাসের সহিত সামান্য আমলও খায়র-বরকত ও সুফলের কারণ হয়। আর এখলাস ব্যতীত আমল না দুনিয়াতে কোন উপকারে আসে, না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে কোন সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত মুআয (রাযিঃ)কে যখন হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে নসীহত করুন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে। কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলসমূহের মধ্যে শুধু ঐ আমলকে কবুল করিয়া থাকেন যাহা খালেছভাবে তাঁহার জন্যই করা হইয়াছে।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত এবং তোমাদের মাল-দৌলত দেখেন না বরং তোমাদের দিল এবং তোমাদের আমলকে দেখেন। কাজেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল জিনিস হইল এই কাজকে এখলাসের সাথে করা। রিয়া ও লোকদেখানো মনোভাব যেন ইহাতে না থাকে। যে পরিমাণ এখলাস থাকিবে সেই পরিমাণ কাজের মধ্যে তরক্কী ও উন্নতি হইবে।

এই মূলনীতিগুলির সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের সামনে আসিয়া গিয়াছে এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিবার বিষয় এই যে, বর্তমান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পেরেশানী ও

করিয়া নিজেদেরকে নেক আমল দ্বারা গড়িয়া তুলিব তখন আমরা সারা দুনিয়ার বাদশাহী ও খেলাফতের উপযুক্ত হইতে পারিব এবং আমাদেরকে সালতানাত ও হুকুমত দেওয়া হইবে—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (نور- ৫৫)

তম মিন জোলুগ ঈমান লাওন অর নিক মিল
করিন অন সে الله تعالى وعده فرماتا ہے
করান কوز মিন মিন حکومت عطا فرمائے
گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت
دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند
کیا ہے اس کو ان کے لئے قوت دے گا
اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن
سے بدل دے گا بشرطیکہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহাদের সহিত আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন, তাহাদিগকে জমিনে হুকুমত দান করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকে হুকুমত দান করিয়াছেন। যে দ্বীনকে তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন উহাকে তাহাদের জন্য মজবুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতিকে তিনি আমানের দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। তবে শর্ত এই যে, আমার এবাদত করিতে থাকিবে এবং কাহাকেও আমার সহিত শরীক করিবে না। (নূর, আয়াত-৫৫)

এই আয়াতে পুরা উম্মতের সহিত ঈমান ও নেক আমলের উপর হুকুমত দান করার ওয়াদা করা হইয়াছে। যাহার বাস্তব প্রকাশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে শুরু করিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানা পর্যন্ত একাধারে ঘটিয়াছে। যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছুঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় ইসলামের পতাকা তলে চলিয়া আসে। পরবর্তী যমানায় একাধারে না হইলেও বিভিন্ন সময়ে নেককার বাদশাহ ও খলীফাগণের বেলায় এই ওয়াদার বাস্তবায়ন ঘটিতে থাকে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (بيان القرآن)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হইবে। (মায়দা, আয়াত-৫৬)

সুতরাং জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ ও ইজ্জত-সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিতে হইলে ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই যে, আমরা এই তরীকায় মজবুতির সহিত কাজ করিতে থাকি এবং আমাদের ইনফেরাদি ও ইজতেমায়ী সর্বপ্রকার শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেই—

وَأَعْمُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (المائدة)

অর্থ :—তোমরা সকলেই দ্বীনকে মজবুতভাবে আকড়াইয়া ধর ; পরস্পর খণ্ড-বিখণ্ড হইও না। (আলি-ইমরান, আয়াত-১০৩)

ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ‘নেজামে আমল’ বা কর্মপদ্ধতি যাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জিন্দেগী এবং আমাদের পূর্ববর্তী আদর্শবান বুয়ুগানে দ্বীনের জিন্দেগীর নমুনা। ‘মেওয়াত’ এলাকায় বেশ কিছুদিন যাবত এই কর্মপদ্ধতির অনুসরণে মেহনত চলিতেছে। এই ভাঙ্গাচুরা মেহনতের ওসীলায় সেই এলাকাবাসী দিন দিন উন্নতি করিয়া যাইতেছে। এই কাজের বরকত ও কল্যাণ সেই এলাকায় এমনভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে, যাহা স্বচক্ষে দেখার সহিত সম্পর্ক রাখে। যদি সকল মুসলমান মিলিতভাবে এই জীবন পদ্ধতিকে এখতিয়ার করিয়া নেয় তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা এই যে, তাহাদের সকল মুসীবত ও মুশকিল দূর হইয়া যাইবে, তাহারা ইজ্জত-সম্মান ও সুখের জিন্দেগী লাভ করিবে এবং নিজেদের হারানো শান-শওকত ও মান-মর্যাদা পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইবে—

وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ (سافات)

অর্থ : ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের জন্য।

(মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

আমি আমার উদ্দেশ্যকে যথাসাধ্য গুটাইয়া পরিষ্কারভাবে পেশ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহা শুধুমাত্র কতকগুলি প্রস্তাবেরই সমষ্টি নহে বরং একটি বাস্তব কাজের নকশা। যাহা আল্লাহর মকবুল বান্দা (আমার পরম শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ছাহেব রহঃ) লইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই পবিত্র কাজের জন্য নিজের জীবনকে ওয়াকফ করিয়াছেন। কাজেই আপনার জন্য জরুরী হইল যে, এই সামঞ্জস্যহীন লাইন কয়টি পড়িয়া ও বুঝিয়াই যথেষ্ট মনে করিবেন না বরং এই কাজকে শিখুন, এই

পদ্ধতির বাস্তব নমুনা দেখিয়া উহা হইতে ছবক হাসিল করুন এবং নিজের জীবনকে এই ছাঁচে গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টা করুন।

শুধু এই দিকে মনোযোগী করাই আমার উদ্দেশ্য ; কাজেই এখানেই শেষ করিলাম—

مُجْهَوْلٌ كَمْجُومٍ نَظَنَ فِيهِ أَنَّ كَافًا كَيْلَتِ

مِيرَى قِسْمَتِ سَ الْهَى پائیں یی رنگ قبول

অর্থ : তাহার আঁচলে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি কিছু ফুল বাছিয়া লইয়াছি। আমার কিসমত-গুণে হে মাওলা ! উহা যেন কবুলিয়াতের সৌভাগ্য লাভ করে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ